159 159 159/Gift

শিক্ষা ও সাহিত্য

Teacher's Journal

VOL.LXXXIII NO.8 AUGUST, 2004

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি

THE ALL BENGAL TEACHERS ASSOCIATION · UNION IS STRENGTH

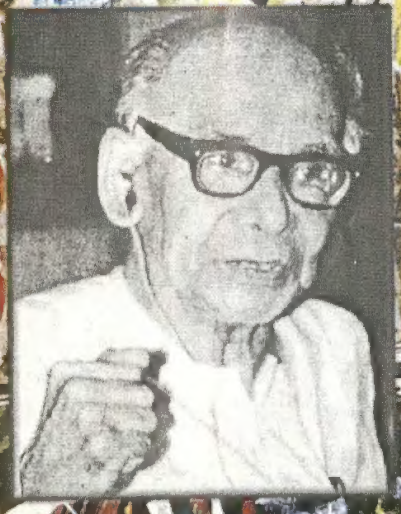

159/Gift

159

শিক্ষা ও সাহিত্য
Teachers' Journal

ভাদ্র, ১৪১১ আগস্ট, ২০০৪

৮৩তম বর্ষ ঃ অষ্টম সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথ 'লোভ' নামক 'মৃত্যুশেল' সমাজদেহ থেকে উৎপাটিত করা যে কত দুরূহ তা জানিয়ে সোভিয়েত জনগণকে সতর্ক করে দেন আর সঙ্গে সঙ্গে আশীর্বাদও জানিয়ে আসেন (যা মতলব করে সবার মন থেকে মুছে দেওয়া হচ্ছে বেশ কিছুকাল ধরে)। তিনি Zvestia পত্রিকাকে বলেছিলেন ঃ "তোমাদের কাজে কতকগুলো গলদের কথা বলেছি। কিন্তু বিশ্বাস করো, দেখাতে চেয়েছি 'চাঁদের কলঙ্ক' (the shadow side of the moon)– তোমাদের কাজ যেন কলঙ্কশূন্য হয়।"

কমিউনিস্ট ইস্তাহার : মানব অভ্যুদয়ের তূর্যধ্বনি—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
যুগের যন্ত্রণা : প্রত্যয়ের সংকট, পৃষ্ঠা ১৭০

C. C. R. E. ... Library ... 10/3, B. C. Road

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি

সমিতি কার্যালয় : সত্যপ্রিয় ভবন, পি-১৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-১৩ ফোন : ২২১৫-৯১৫৮, ২২১৫-৮৮৫৬
ফ্যাক্স : ২২১৫-৭৯৩২
পত্রিকা কার্যালয় : ১৫নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ ফোন : ২২৪১-২৯৫৪

সম্পাদক
শ্রীপ্রশান্ত ধর

যুগ্ম-সম্পাদক
শ্রীশিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পশুপতি ঘোষ-এর

মুশকিল আসান

Hand Book of Pension, Pay-Fixation-বইটির পরিবর্তে

পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়ে পুনরায় প্রকাশিত হল

মাধ্যমিক শিক্ষকদের চাকুরিগত সমস্যা ও সমাধান

☆ এতে আছে ☆

• চাকরি-সংক্রান্ত নিয়মাবলী। • স্থায়ীকরণের নিয়মাবলী। • ডেপুটেশনের নিয়মাবলী। • বরখাস্ত ও সাময়িক বরখাস্তের নিয়মাবলী। • কম্প্যাসনেট গ্রাউন্ডে চাকরির নিয়মাবলী। • বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির চাকরি-সংক্রান্ত ক্ষমতা। • চাকরিতে ইস্তফা অথবা স্বেচ্ছায় অবসরের নিয়মাবলী। • চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে অন্য বিদ্যালয়ে যোগদানের নিয়মাবলী। • ব্রেক সারভিস মুকুবের নিয়মাবলী। • লিয়েন-সংক্রান্ত নিয়মাবলী। • পদবী বদলের নিয়মাবলী। • হাজিরা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী। • অনুমোদিত ট্রেনিং ডিগ্রী/ডিপ্লোমা। • জাল বিশ্ববিদ্যালয়। • অপশন বদলের নিয়মাবলী। • এস. এস. সি.-তে পুনরায় পরীক্ষা দেবার নিয়মাবলী। • প্রধানশিক্ষক পদের যোগ্যতা ও নিয়োগ পদ্ধতি। • সহকারী প্রধানশিক্ষক পদের যোগ্যতা ও নিয়োগ পদ্ধতি। • ছুটির নিয়মাবলী। • বাড়িভাড়া ভাতার নিয়মাবলী। • বেতন নির্ধারণের নিয়মাবলী। • পেনশন ও অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা। • ১.৪.৮১-র পূর্বে অবসর/মৃত্যুর ক্ষেত্রে পেনশন ও পারিবারিক পেনশনের নিয়মাবলী। • প্রভিডেন্ট ফান্ড। • বৃত্তিকরের নিয়মাবলী। • মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক নিয়মাবলী।

B. M. PUBLISHERS

10/1, Ramanath Mazumder Street, Kolkata-700 009
Phone : 2241-8647, 2219-2626/8733
E-mail : bmpl@cal3.vsnl.net.in

NOW AVAILABLE

SAMPLE QUESTIONS FOR MADHYAMIK EXAMINATION IN ENGLISH

A practical guide to the testing of Reading and Writing Skills, Grammar and Vocabulary at the Madhyamik Examination, 2000 A. D. and onwards.

Price : Rs. 20.00 each

Contact :

A. B. T. A. Office

Satyapriya Bhawan
P-14, Ganesh Chandra Avenue
Kolkata-700 013

Acc. no - 16015

শিক্ষা ও সাহিত্য

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

❐ স্বাধীনতার ফসল ৮৫৯

সমিতির ডাক ৮৬০

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ্ মনস্বী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে সমিতির শ্রদ্ধাঞ্জলি ৮৬২

প্রভাত এসেছে মেঘের সিংহবাহনে

❐ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৮৬৬

আজকের শিক্ষা আন্দোলনের অভিমুখ

❐ অমল ব্যানার্জী ৮৭৪

সময়ের অভিমুখ ঃ আমাদের কর্তব্য

❐ অপরেশ ভট্টাচার্য্য ৮৭৭

গৈরিকদূষণ থেকে মুক্ত হোক শিক্ষার অঙ্গন

❐ অসিতকুমার ভৌমিক ৮৮১

ছুটি নিয়ে দু'চার কথা ❐ দীপালী সেনশর্মা ৮৮৪

ফিরে দেখা

সমিতির বোলপুর আঞ্চলিক শাখার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

❐ তারাশঙ্কর রায়চৌধুরী ৮৮৬

সময়াভিযান ❐ দুর্গাদাস ভট্ট ৮৮৮

Pragmatism : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দর্শন

❐ অধ্যাপক দিলীপ নারায়ণ ঘোষ রায় ৮৯৩

ঠিক মত বাঁচব — মোটা হব না

❐ ডাঃ কুন্তল বিশ্বাস ৯০০

শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীদের স্বাস্থ্য পরিষেবা

❐ লুৎফুল আলম ৯০৩

প্রতিবেদন ৯০৪

কবিতা

২২শে শ্রাবণ কবিকে ❐ উৎপল ঘোষ ৯১২

এপার ওপার ❐ তারাপ্রসাদ সাঁতরা ৯১২

সভ্যতার দুঃসময় চলছে ❐ সৈয়দ আব্দুল হামিদ ৯১৩

এ কী ভাষার মালা ❐ ননীগোপাল জানা ৯১৩

মুক্তি ❐ রতিকান্ত মালাকার ৯১৩

বেজেছে বিউগল ❐ বরুণচন্দ্র পাল ৯১৩

তিতাস নদীর পরস্তাব ❐ নিখিলেশ রায় ৯১৪

মহাবিশ্বের কবিতা ❐ নিখিলেশ রায় ৯১৪

বৃষ্টির বর্ণমালা ❐ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯১৪

ম্লানতা ❐ রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল ৯১৫

কবির হাতেতে থাকে তবু সোনার কলম ❐ নিমাই মান্না ৯১৫

প্রেম সাম্যে বেঁধে নিতে ঘর ❐ বলরাম চক্রবর্তী ৯১৬

কুম্ভোকণম ঃ সেই দিনগুলি, রাতগুলি ❐ অশোক অধিকারী ৯১৬

সমিতি সংবাদ ৯১৭

শোক ৯২২

গ্রন্থাবলোকন ৯২৩

পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ৯২৭

পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন সংক্রান্ত ট্রেন ও বাসের সময় নির্ঘন্ট ৯২৯

Teachers' Journal

CONTENTS

Editorial

❐ Education and the UPA Govt ৯৩১

Call of the Association ৯৩৩

Passing of a scholar-politician

A Homage Sans Illusion

❐ Ashok Mitra ৯৩৫

Stern Duty Ahead – Meet the Social Challenge ❐ Sumay Ray ৯৩৮

Human Beauty, Art and Philosophy in Rabindranath Tagore's Literature

❐ Manoranjan Das ৯৪৩

Poem

In Memoriam

❐ Hirendra Sankar Bhattacharyya ৯৪৮

Proforma for Restoration of Commuted portion of Pension of the Teachers and Employees ৯৪৯

ABTA Inter Evaluation Programme, 2004 ৯৫০

Board Circular ৯৫৫

প্রচ্ছদশিল্পী ঃ রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল
(ইনসেটে প্রয়াত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)

বিদ্যালয়ের সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য অপরিহার্য জরুরী বই

JUST OUT! March 2004 Edition JUST OUT!

AN EXHAUSTIVE **HEADMASTERS' MANUAL** Rs. 600/-

WITH ALL UPTO DATE CIRCULAR REGARDING SCHOOL ADMINISTRATION

জানুয়ারী ২০০৪ সংস্করণ **বাংলায় সমগ্র হেডমাস্টার্স ম্যানুয়েল** মূল্য : ৫৫০ টাকা

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ এবং সরকারী শিক্ষা দপ্তর, অর্থ দপ্তর, পেনসন এবং স্থল সার্ভিস কমিশনের সমস্ত আইন ও আদেশনামার বাংলায় সম্পূর্ণ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সমেত।

শিক্ষকদের বেতনক্রম এবং ছুটির নিয়মাবলী সংক্রান্ত নানা সমস্যার উত্তর পেতে সংগ্রহ করুন

(মার্চ ২০০২ সংস্করণ) **শিক্ষকদের বেতনক্রম ও ছুটির নিয়মাবলী ঃ সমস্যা ও সমাধান** মূল্য : ১৫০ টাকা

বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির নির্বাচন, গঠন এবং পরিচালক সমিতি সংক্রান্ত নানা জটিল সমস্যার উত্তর পেতে সংগ্রহ করুন

(ফেব্রুয়ারী '৯৯ সংস্করণ) **বিদ্যালয়ের অনুমোদন ও পরিচালন ব্যাবস্থা ঃ সমস্যা ও সমাধান** মূল্য : ৬০ টাকা

অবসরের দিনেই পেনসন পেতে হলে কিভাবে ROPA-'98 এর নতুন সরকারী নিয়মে পেনসন পেপার পূরন করতে হবে এবং আপনার করণীয় কি কি জানতে হলে আজই সংগ্রহ করুন।

(February 2000 Edi.) ***HOW TO PREPARE SCHOOL PENSION PAPERS*** Rs. 125/-

সঠিক পেনসন বুকলেট পূরণের সুবিধার জন্য বিভিন্ন নমুনার সাহায্যে সহজ ভাবে লিখিত।

ROPA-98 এর সর্বশেষ নির্দেশ অনুযায়ী নির্ভূল সার্ভিস বুক পূরনের জন্য একমাত্র সাহায্যকারী পুস্তক

(September 2001 Edi.) **HOW TO PREPARE SCHOOL SERVICE BOOK** Rs. 150/-

B. B. KUNDU & SONS ☐ 79/2, M. G. Rd, Kolkata-9, Phone : 22415347

কলকাতা জেলা শাখা পরিচালিত

হলিডে হোম

পুরী গৌরবাটশাহী

যোগাযোগের ঠিকানা : কলকাতা জেলা শাখা

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ ঃঃ *দূরভাষ : ২২৪১-২৯৫৪*

উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা শাখা পরিচালিত

হলিডে হোম

সত্যপ্রিয় রায় বিশ্রাম নিলয়

মধুপুর (বিহার)

যোগাযোগ করুন — দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা শাখার কার্যালয়।

১৯১/১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট (ত্রিতল), কলকাতা-৭০০ ০১২ ঃঃ *দূরভাষ ঃ ২২৪১-৯৩৫৩*

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতার ফসল

স্বাধীনতার ৫৮তম বর্ষেও স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণ হয় নি। শত শত শহীদের রক্তমূল্যে অর্জিত স্বাধীনতা অগণিত দেশবাসীর খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-স্বাস্থ্যের কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারে নি। সেই অর্থে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফসল আমাদের দেশের শাসকবর্গের শ্রেণি দৃষ্টির সংকীর্ণতার কারণে অগণিত বঞ্চিত মানুষের কাছে অর্থবহ হয়ে উঠলো না।

সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। কেন্দ্রের বি জে পি-জোট শাসনে ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি গণতান্ত্রিক জীবনবোধকে পর্যুদস্ত করার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করেছিল। ভারতের আবহমানকালের বহুত্ববাদী সহনশীলতা এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সাংস্কৃতিক পরম্পরাকে সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতার চোরাবালিতে নিমজ্জিত করার সাংগঠনিক কাঠামো নির্মাণ করে ফেলেছিল।

এই প্রেক্ষাপটে ভারতের জনগণ সাধারণ নির্বাচনে বি জে পি-জোট সরকারকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। পুনরায় কংগ্রেস-জোট রাজনীতির বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচির ভিত্তিতে কেন্দ্রে সরকার গঠন করে। বামফ্রন্ট পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী এই সরকারকে সমর্থন করার বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করে সমর্থন ও গণআন্দোলনের কার্যক্রম গ্রহণ করার সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইতোমধ্যেই এই সরকার জনবিরোধী আর্থিক নীতি নানাক্ষেত্রে রূপায়িত করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে। তার বিরুদ্ধে সংগঠিত গণআন্দোলন ও গণসংগ্রাম গড়ে তোলা ছাড়া অন্য বিকল্প নেই। সেই সঙ্গে অধিকতর সমন্বয়ের জন্য বামফ্রন্ট সংগঠিত উদ্যোগ শুরু করে চলেছে।

বি জে পি-জোট সরকার শিক্ষার উপর যে নগ্ন আক্রমণ নামিয়ে এনেছিল কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার তার নিরসনে কিছু ব্যবস্থা এবং ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে চলেছে। কিন্তু শিক্ষার ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি এখনো রূপায়িত হয় নি।

শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠনগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলনে সামিল হতে হবে। গণতান্ত্রিক জীবনবোধকে জীবনের সর্বস্তরে কর্মে ও চিন্তায় এবং সামাজিক দায়বদ্ধতায়, আচরণে প্রতিফলিত করতে হবে। প্রতিক্রিয়ার শক্তিশালী মাধ্যমগুলি সর্বক্ষেত্রে 'মগজ' দখলের লাগাতর কর্মপরিকল্পনা রূপায়িত করে চলেছে। সঙ্ঘশক্তিকে ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন জীবনযাপনে পরিণত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এই কাজে প্রতি মুহূর্তে অবৈরীমূলক দ্বন্দ্বগুলিকে প্রধান করে দেখাবার চেষ্টা হচ্ছে। সাংগঠনিক কর্মোদ্যোগের মধ্যে পারস্পরিক সংহতির বাতাবরণকে ক্রমাগত নষ্ট করার ষড়যন্ত্র করে চলেছে এই মাধ্যম ও তার উচ্ছিষ্ট ভোগী তথাকথিত বুদ্ধিজীবী 'দুর্বৃত্তরা'।

অবক্ষয়িত সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণার পচাগলা অনুভূতিগুলিকে প্রতিনিয়ত সঞ্চার করার চেষ্টা হচ্ছে সমস্ত মানুষের মগজের মধ্যে। সমালোচনা-আত্মসমালোচনার সুস্থ বাতাবরণের পরিবর্তে 'হেয়' প্রতিপন্ন করার অসুস্থ মনোবিকার সর্বস্তরে সঞ্চারিত করার উদ্যোগ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সাংগঠনিক বোঝাপড়ার মধ্যদিয়ে চিন্তা ও কাজের সেতুবন্ধন ঘটিয়ে এই অশুভ প্রবণতাকে পর্যুদস্ত করতে হবে।

আমাদের স্বাধীনতার ফসলকে শোষিত-বঞ্চিত মানুষের নাগালে পৌঁছোবার জন্য গণআন্দোলন ও গণসংগ্রামকে সংগঠিতভাবে জয়যুক্ত করতে হবে।

সমিতির সাধারণ সম্পাদক অমল ব্যানার্জী কিছুটা সুস্থ হয়ে ১৬ই আগস্ট কার্যভার পুনরায় গ্রহণ করেছেন।

১১.০৮.২০০৪

সমিতির ডাক

অমল ব্যানার্জী
সাধারণ সম্পাদক

প্রয়াত হয়েছেন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব হীরেন মুখোপাধ্যায়। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের এক নিষ্ঠাবান সহযোদ্ধা ও শিক্ষক দীর্ঘ ৯৭ বছর তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে কোন কুণ্ঠাবোধ করেন নি। ১১ই আগস্ট, ২০০৪ মহাজাতি সদনে স্মরণসভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যথার্থভাবেই বলেছেন, তাঁর মৃত্যুতে দুঃসময়ে আমরা একজন অভিভাবককে হারালাম। তাঁর জীবনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি সাধ্যমত আয়ত্ত করার প্রয়াসের মধ্যদিয়ে আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করব।

নতুন পরিস্থিতির সঠিক উপলব্ধি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেন্দ্রীয় সরকারের 'সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচি'তে গরীব-মধ্যবিত্ত মানুষের স্বার্থসংশ্লিষ্ট যে বিষয়গুলি আছে তা রূপায়ণের জন্য বিভিন্ন গণ-সংগঠন যখন আন্দোলনে অবতীর্ণ হবে তখন আমরা কি চুপ করে বসে থাকব ? শিক্ষার সাথে যুক্ত যে সমস্ত বিষয় এবং এন ডি এ সরকার শিক্ষার ক্ষেত্রে যে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়ে গেছে, তার হাত থেকে মুক্ত করার জন্য যে উদ্যোগ নিতে বর্তমান সরকারকে বলা হয়েছে, সেসব বিষয়গুলি দ্রুত কার্যকর করানোর জন্যও দরকার আন্দোলন। দরকার যৌথ উদ্যোগ, ব্যাপক আন্দোলন। আবার এই আন্দোলনের হাতিয়ার করতে হবে সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচিকেই। ক্ষমতায় ফিরতে দেওয়া যাবে না ধর্মীয় ফ্যাসিস্ট শক্তিকে। রক্ষা করতে হবে ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রকে।

সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে ছুটিতে ছিলাম তিন মাস। শ্রদ্ধেয় সভাপতি, মাননীয় সহ-সভাপতিগণ, প্রিয় সহ-সম্পাদকগণ, বিশেষ করে ভারপ্রাপ্ত মিত্রা ভট্টাচার্য্য, কমরেড কোষাধ্যক্ষ, বন্ধুবর পত্রিকা সম্পাদক ও পত্রিকা যুগ্ম-সম্পাদক সকলে মিলে এই তিনমাস বাড়তি দায়িত্ব পালন করেছেন। সকলকে আমার তরফ থেকে বিশেষ অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই তিনমাস আমি দু'একদিন দপ্তরে আসলেও কার্যত সব কাজই করেছেন আমার সহযোদ্ধা বন্ধুরা।

প্রস্তুতি শুরু হয়েছে সম্মেলনের। আঞ্চলিক সম্মেলনের কাজ শেষ হয়ে শুরু হতে চলেছে মহকুমা সম্মেলন। এরপর হবে জেলা সম্মেলন। জেলা সম্মেলনকে কেন্দ্র করে করা দরকার প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সেমিনার ও কর্মশালা। শিক্ষা আন্দোলনের বর্তমান অভিমুখ পশ্চিমবাংলার প্রেক্ষাপটে প্রথাগত ব্যবস্থাকে রক্ষার আঙ্গিকে মানোন্নয়নের প্রসঙ্গ। শ্রেণিশিখনের গুরুত্ব অপরিসীম। এই বিষয়টিকে আমাদের গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার। এই বিষয়ে প্রতীচি ট্রাস্টের প্রতিবেদন একটু পাতা উল্টে দেখতে বলব, যদিও ঐ প্রতিবেদন প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে।

রাজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতির কাজও শুরু হয়েছে। গঠিত হয়েছে অভ্যর্থনা কমিটি। সাধারণ সম্পাদকের সম্মতি অনুযায়ী ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সময়মত বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে দিয়েছেন। প্রয়োজনীয় তথ্য জেলা দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে জ্ঞাতব্য বিষয় জানানো হবে। সর্বস্তরে সম্মেলন সফল করে তোলার কাজ অব্যাহত রাখার জন্য সকলকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

১২ই আগস্ট পালিত হলো এস টি এফ আই-এর প্রতিষ্ঠা দিবস। সর্বভারতীয় দাবীদিবস হিসেবে এই দিনটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে গত ১৩ই জুলাই তারিখে সর্বভারতীয় নেতৃত্ব যে স্মারকলিপি পেশ করে ডেপুটেশন দেন এবং শিক্ষামন্ত্রী এস টি এফ আই নেতৃত্বের সাথে মূলত সহমত পোষণ করেন, তা সর্বত্র

সদস্যবন্ধুদের কাছে তুলে ধরা হয়। তবে এখনও পর্যন্ত যা রিপোর্ট এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে মহকুমা স্তরে রাজ্যব্যাপী সর্বত্র এ বি পি টি এ'র সাথে যৌথভাবে কর্মসূচি পালন ঠিকমত করা যায় নি। ভবিষ্যতে এব্যাপারে আরও পরিকল্পিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

আগামী ২০শে আগস্ট তারিখে শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষকদের যৌথ উদ্যোগে ৭ দফা দাবীতে দেশব্যাপী জাতীয় দাবীদিবস পালিত হবে। এই কর্মসূচি সফল করে তুলতে আমাদের যথোপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে হবে। সর্বত্র সমস্ত সদস্যবন্ধুদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেবার উদ্যোগ সর্বত্র নিতে হবে। বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়ের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করার ময়দান। পাশাপাশি মনে রাখতে হবে গণ-আন্দোলনই গণতন্ত্রকে রক্ষা করার হাতিয়ার।

১লা সেপ্টেম্বর শান্তি মিছিলের আহ্বানকে সফল করে তুলতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এই অভিযানে ব্যাপক অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে আমাদের সমিতিকেও। আমাদের ঐতিহ্যবাহী মর্যাদা রক্ষা করতে মহানগরীর সংলগ্ন জেলাগুলিকে বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

১৬·০৮·২০০৪

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির নতুন প্রকাশনা

∞ প্রকাশিত হল ∞

আচার্য কাহিনি — বাংলা ছোটগল্পে শিক্ষক/মূল্য ঃ ৫০টাকা

গঠনতন্ত্র — মূল্য ৬টাকা

সমিতির ডাক — মূল্য ২টাকা

প্রাপ্তিস্থান ঃ নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি
পি-১৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ
কলকাতা-৭০০ ০১৩

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ্ মনস্বী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে সমিতির

শ্রদ্ধাঞ্জলি

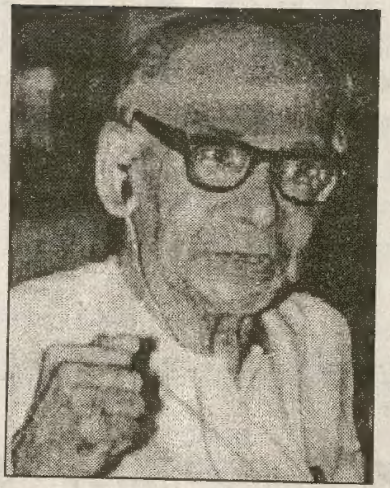

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্কৃতির ঐতিহ্যের সমন্বয়ে গঠিত ছিল যাঁর ব্যক্তিত্ব, পারঙ্গমতার বহুতর ক্ষেত্রে যাঁর ছিল প্রভাময় অবাধ বিচরণ, যাঁর বস্তুনিষ্ঠ পাণ্ডিত্য সমৃদ্ধ করেছে সমাজবিজ্ঞান, স্বদেশ ও বিশ্ব ইতিহাস চর্চার ধারাকে, সভ্যতার যে কোনো সংকটে যাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ বার বার আমরা শুনেছি, সমাজের অসহায়, দরিদ্র, অধিকার-বঞ্চিত মানুষের সংগ্রামে যিনি ছিলেন প্রেরণা, যাঁর ওজস্বী বাগ্মীতা ছিল ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রহরী, যাঁর সুনিপুণভাবে রচিত ও রসজ্ঞ মননশীলতায় সমৃদ্ধ প্রবন্ধমালা ভারতের সাহিত্যসাধনায় এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে, সেই হীরেন্দ্রনাথ গত ৩০শে জুলাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বৎসর।

১৯০৭ সালের ২৩শে নভেম্বর কলকাতার ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রিটের পারিবারিক বাসগৃহে তাঁর জন্ম হয়। বাবা সুপণ্ডিত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মা প্রফুল্লনলিনী দেবী। তিনি ১৯২২ সালে তালতলা হাই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ছাত্রবৃত্তি পেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পাঁচটি বিষয়ে লেটার পেয়েছিলেন তিনি। ১৯২২ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। ১৯২৪ সালে আই এ পরীক্ষায় প্রথম হন। ইংরেজি, ইতিহাস ও লজিক-এ তিনি প্রথম হন, সংস্কৃতে দ্বিতীয়। স্বর্ণপদক, 'Duff' স্কলারশিপ এবং 'হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন' পুরস্কার লাভ করেন। ১৯২৬ সালে তিনি ইতিহাস (সাম্মানিক) নিয়ে স্নাতক হন, মানবিক বিদ্যা বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেন এবং স্বর্ণপদক ও ঈশান স্কলারশিপ, বর্ধমান স্কলারশিপ, ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপ লাভ করেন। ১৯২৮ সালে স্নাতকোত্তর পরীক্ষাতেও ইতিহাসে প্রথম স্থান অর্জন করেন। সব ক'টি পত্রেই প্রথম হন। স্বর্ণপদক লাভ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রতিনিধিরূপে ১৯২৭ সালে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন এবং প্রথম স্থান অধিকার করেন।

১৯২৭ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি। ১৯৩৬ সালে জানুয়ারি মাসে কলকাতার এলবার্ট হলে নিখিলবঙ্গ ছাত্র সম্মেলনের সভাপতি হন। ১৯৪০ সালে নাগপুরে সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলনের সভাপতি হন।

বাংলা সরকারের স্কলারশিপ পেয়ে ১৯২৯ সালে ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন। সেখানে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ক্যাথারিনস কলেজে ভর্তি হন। ১৯৩১ সালে Honour School Modern History-র পাঠের পর B A (Oxon) ডিগ্রী লাভ করেন যা কয়েক বছর পরে M A'র সমতুল্য বলে গণ্য করা হয়। ১৯৩৩ সালে অক্সফোর্ড থেকে গবেষণা ডিগ্রী B Litt প্রাপ্ত হন। The Honourable Society of Lincoln's Inn-এ যোগ দিয়ে পরীক্ষান্তে ১৯৩৪ সালের মে মাসে Court of King's Bench (London)-এ ব্যারিস্টার হিসাবে স্বীকৃত হন।

দেশে ফিরে অধ্যাপক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের আগ্রহে ওয়ালটেয়ারে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস ও রাষ্ট্রতত্ত্বের সিনিয়র লেকচারার হিসাবে যোগ দেন এবং ১৯৩৫ পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। আইন ব্যবসার জন্য কলকাতায় ফিরলেও তিনি অধ্যাপনাকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করে কলকাতার রিপণ কলেজে ইতিহাসের বিভাগীয় প্রধানের পদে যোগ দেন। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। পাশাপাশি ১৯৪০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস ও রাষ্ট্রদর্শনের অধ্যাপক পদে যোগ দেন। তিনি ১৯৪৪ পর্যন্ত এই পদে আসীন ছিলেন।

কোন্ প্রত্যয় থেকে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতো

ব্যক্তি কমিউনিস্ট আন্দোলনে এসে যুক্ত হয়েছেন? হীরেন্দ্রনাথ তাঁর "তরী হতে তীর" গ্রন্থের ৩১৮ পৃষ্ঠায় এর উত্তর দিয়েছেন: "কোনো নাটকীয় মুহূর্তে নয়, তবে সহজ-স্বাভাবিক বিবর্তনেই আমার দেশাভিমান পরিণতি পেয়েছিল মার্কসবাদে।"

১৯৩৬ সালের শেষদিকে কলকাতার শহরতলিতে এক গোপন কেন্দ্রে তদানীন্তন সম্পাদক পি সি যোশীর আগ্রহে ও উৎসাহে তৎকালে বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়ার সদস্যপদ প্রাপ্ত হন। হীরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "এ আমার দ্বিতীয় জন্মলাভ"।

১৯৩০-৩১ সালে লণ্ডনের হাইড পার্কে মে-দিবসের মিছিলে, ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণির সভায় বক্তৃতা করেছেন তিনি। পার্টির তৎকালীন 'Popular Front' নীতি অনুসারে ১৯৩৬ সালেই কংগ্রেসে যোগ দেন এবং কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য হন। ১৯৩৭-৩৯ কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির বঙ্গীয় শাখার অন্যতম সম্পাদক নিযুক্ত হন। ওই পদাধিকার বলে ১৯৩৮-৩৯ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্য হন। ১৯৪০ ও ১৯৪১ সালে তিনি কারাবরণ করেন। ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হয়। সারা দেশের নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে তিনিও গ্রেপ্তার হন এবং সাত মাস বিনাবিচারে কারাবন্দী থাকেন।

১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উন্মত্ত শহরে শান্তি ফিরিয়ে আনার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন সারা জীবন। 'কোরক' পত্রিকার পক্ষ থেকে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: "বি জে পি'র উত্থানকে আপনি কি ক্ষতিকর মনে করেন?" উত্তরে হীরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "ফ্যাসিজম নামে যে ন্যাক্কারজনক নৃশংস নোংরামি ইতিহাসকে কলুষিত করেছে, তারই এক ভারতীয় সম্মার্জিত সংস্করণ হলো বি জে পি।"

১৯৪৭ থেকে কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির সদস্য হন। ১৯৪৩-এ কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস (বোম্বাই)-এ যোগদান করেন। ১৯৫৮ সালে পার্টির অমৃতসর কংগ্রেসে জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হন। ১৯৮২ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে লিবিয়াতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৮২ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধী শক্তির প্রার্থী হিসাবে তাঁকে মনোনীত করে। ১৯৮৭ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের ৭০বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন।

১৯৪৬ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বেঙ্গল মোশান পিকচার এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন। গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন তিনি চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশক জুড়ে। সেই সময়ে পোস্টাল অ্যাণ্ড আর এম এস ইউনিয়ন (বেঙ্গল সার্কেল)-এর সভাপতি। বীমা কর্মীদের প্রাদেশিক ও সর্বভারতীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৫২ সালের নির্বাচনে উত্তর-পূর্ব কলকাতা কেন্দ্র থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মনোনীত প্রার্থী হিসাবে জয়লাভ করেন। এরপর নিরবচ্ছিন্নভাবে আরও চারবার ১৯৫৭, ১৯৬২, ১৯৬৭ ও ১৯৭১ সালে ঐ একই কেন্দ্র থেকে পার্টি মনোনীত প্রার্থী হিসাবে জয়লাভ করেন। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৪ লোকসভায় পার্টির সহকারী নেতা এবং ১৯৬৪-৬৭ নেতা নির্বাচিত হন।

সংসদের উভয়কক্ষের Public Accounts Committee-তে চারবার নির্বাচিত হন। ১৯৭৫-৭৭-এ তিনি এই কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬২ সালে তিনি National Integration Council-এর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৬-৭৭ সালে বিশ্বভারতী সংসদের সভ্য হন। প্রায় ১৪ বছর ধরে তিনি All India Sports Council-এ সংসদের প্রতিনিধি সদস্য ছিলেন। ১৯৭৮ সালে লোকসভার অধ্যক্ষ কে এস হেগড়ের অনুরোধে Bureau of Parliamentary Studies and Training-এর এবং Parliamentary Library বিষয়ে সাম্মানিক উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৮ সালে অষ্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায় অনুষ্ঠিত Commonwealth Parliamentary Conference-এ ভারতীয় সংসদের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে পশ্চিম আফ্রিকার ক্যামেরুনে, সেপ্টেম্বরে রোমে International Parliamentary Union-এর সভায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। সংসদ জীবনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে Portrait of Parliament 1952-77 : Reflection and Remenescence (Vikas, Delhi) প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে। তিনি ছিলেন ভারতীয় সংসদের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী। লোকসভায় তাঁর আক্রমণাত্মক বক্তৃতা প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে মন দিয়ে শুনতে হতো।

ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ১৯৯০ সালে তাঁকে 'পদ্মভূষণ' এবং ১৯৯১ সালে 'পদ্মবিভূষণ' সম্মানে ভূষিত করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে তাঁর 'চরৈবেতি চরৈবেতি' গ্রন্থের জন্য ১৯৯২ সালে 'বিদ্যাসাগর' পুরস্কার প্রদান করা হয় তাকে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ২০০০ সালে তাঁকে 'নজরুল পুরস্কার' দিয়ে সম্মানিত করেছে। সোভিয়েত বিপ্লবের ৬০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে মস্কোস্থিত VOKS-এর পক্ষ থেকে তাঁকে আন্তর্জাতিক মৈত্রী পুরস্কার পদক প্রদান করা হয়। ১৯৭৭ সালে তিনি সোভিয়েত ল্যাণ্ড নেহরু পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪১-৪৫-এর যুদ্ধ নিয়ে লেখা তাঁর বই Epic Victory সোভিয়েত পুরস্কার লাভ করে। বুলগেরিয়া থেকে তিনি 'দিমিত্রভ স্মারক পদক' প্রাপ্ত হন। কলকাতার মুসলিম সংস্কৃতি সঙ্ঘ তাঁকে মওলানা আজাদ পুরস্কার প্রদান করে ১৯৯৪ সালে। রবীন্দ্রভারতী, কলকাতা, উত্তরবঙ্গ ও কল্যাণী এবং অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডি লিট' ডিগ্রী দিয়ে সম্মানিত করে। ২০০২ সালের ৩০শে নভেম্বর শিশির মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি ও বিদ্যাসাগর ফাউণ্ডেশনের আয়োজনে পঞ্চনবতি বর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাঁকে সারস্বত সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ভারতে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন গড়ে তোলার অন্যতম কারিগর ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ। তরুণ হীরেন্দ্রনাথ ও সমবয়স্ক বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী মিলে একত্রে বাঙলার ছাত্র, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মার্কসবাদী চিন্তাধারা ও প্রগতি চেতনার বীজ বপন করে চলেছিলেন ৩০-এর দশক থেকে। ১৯৩৭ সালে সুরেন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'প্রগতি' শীর্ষক সংকলন গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে বাঙলার তথা ভারতের প্রগতি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটি মাইলস্টোন।

১৯৩৬ সালে কলকাতা কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনে সাহায্য করার জন্য যে কমিটি গঠিত হয় হীরেন্দ্রনাথ তার কোষাধ্যক্ষ হয়েছিলেন।

ইতিহাসকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক-প্রশাসনিক বৃত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক বা এককথায় সার্বিক ইতিহাসেরই চর্চা করেছিলেন তিনি। এই অখণ্ড ও সার্বিক চিন্তা তিনি পেয়েছেন শুধু মার্কসের কাছ থেকে নয়, রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত রচনা 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' তাঁকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রধান ধারা যে রাষ্ট্রনৈতিক নয়, রাষ্ট্রীয় হানাহানি নয়, সামাজিক ইতিহাসের ধারা — রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তা ঐতিহাসিক হীরেন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেছিল। সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস চর্চার নানাবিধ ত্রুটি ও কুফল থেকে হীরেন্দ্রনাথ মুক্ত ছিলেন। তাঁর স্বদেশপ্রেম ছিল নিখাদ। ভারতীয় সভ্যতার মূলগত বৈশিষ্ট্য যে ঐক্য এবং অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টি তা হীরেন্দ্রনাথ অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন।

সমাজতন্ত্রের অক্লান্ত যোদ্ধা হীরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'বিপ্লবের পরাজয় নেই।' ন'টি প্রবন্ধের সংকলন এটি। জ্ঞানের গরিমা আর বুদ্ধির দ্যুতিতে উজ্জ্বল এই প্রবন্ধগুলি চিরকালীন প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে কমিউনিস্টদের কাছে। ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে হীরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন "কয়েকটা দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হলেও সোস্যালিজম-এর সংকট বলে কিছু ঘটেনি।" কিন্তু আবার একথাও মনে করিয়ে দেন, "প্রয়োজন মার্কসীয় তত্ত্বের প্রকৃষ্ট অনুশীলন এবং কমিউনিস্ট পার্টির নৈতিক শক্তির পুনরুজ্জীবন।"

অনুবাদক হীরেন্দ্রনাথ আমাদের এক অমূল্য সম্পদ। বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষাতেই সমান অধিকার থাকার জন্য তিনি বিভিন্ন সময়ে বিপুল কর্মকাণ্ড সামলেও এদেশের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কিছু নিদর্শন বিদেশী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

১৯৪৫-৪৬-এ তিনি অনুবাদ করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্বন্তর'। মন্বন্তর-এর আগে হীরেন্দ্রনাথ তারাশঙ্করের 'তারিণী মাঝি' গল্পটি অনুবাদ করেছেন। অনুবাদ করেছেন 'তরী হতে তীর', অনুবাদ করেছেন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)'র ইতিহাস।

হীরেন্দ্রনাথ নিজেকে 'অনুতাপহীন কমিউনিস্ট' বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাই সমাজতন্ত্রের উত্তরপর্বে 'বিপ্লবের পরাজয় নেই' বলতে পেরেছিলেন। বলতে পেরেছিলেন সাহসের সঙ্গে 'Yes, the Soviet's are my fatherland'। তখন অনেক ধিক্কার দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। আমরা ভুলতে পারি না কমরেড স্তালিন সম্পর্কে তাঁর অভিমতকে। তাঁর দলের পত্রিকাতেই স্তালিনের কার্যাবলীর ঐতিহাসিক শুদ্ধতা নিয়ে বিরাট প্রবন্ধ লিখেছেন। সেই প্রবন্ধের গায়ে কেউ একটি আঁচড় কাটতেও সাহস পায়নি। একেবারে শেষ অধ্যায়ে, গরবাচভ-ইয়েলৎসিন সম্প্রদায় যখন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পৌঁছে গিয়ে দল ও রাষ্ট্রের নিধন ষড়যন্ত্রের উদ্যোগ-আয়োজন মহাসমারোহে সম্পূর্ণ করছেন, আমাদের এখানে অনেকেই চোখ রগড়াচ্ছেন, ঠিক বুঝতে পারছেন না ব্যাপার-স্যাপার, তখন অন্তত দুইজন মহারথী বালচন্দ্র রণদিভে ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিবাদে-নিন্দায়-ঘৃণায় বজ্রনির্ঘোষ-সহ সরব হতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হননি। (আমাদের ইতিহাস

চেতনা শিখিয়েছিলেন যিনি — অশোক মিত্র/'কোরক', হীরেন মুখার্জী সংখ্যা, ১৯৯৫)

তাঁর রচিত বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ যেমন, ভারতবর্ষ ও মার্কসবাদ (১৯৪১), ভারতে জাতীয় আন্দোলন (১৯৪৩), মার্কসবাদের অ-আ-ক-খ (১৯৫৪), তরী হতে তীর (১৯৭৪), বিপ্লবের পরাজয় নেই (১৯৯০), চরৈবেতি চরৈবেতি (১৯৯২), যুগের যন্ত্রণা ঃ প্রত্যয়ের সংকট (১৯৯৯), An Introduction to Socialism (1938), China Calling (1942), Under Marx's Banner (1944), India Struggles for Freedom (1946), Himself a True Poem : A Study of Rabindranath Tagore (1961), Sixty Years of the USSR (1982), Communist in Freedom Struggle (1982) আমাদের মানসিক শক্তি যোগাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবিচল থাকার জন্য।

যে প্রত্যয়ের সংকট আমাদের সামনে উপস্থিত তা থেকে মুক্তি পাবার উপায় লিখে গেছেন হীরেন্দ্রনাথ এই গ্রন্থগুলিতে। হীরেন্দ্রনাথ গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গেই উচ্চারণ করেছেন 'কবির লড়াই'-এ অন্যতম মহারথী রমেশ শীল-এর শেষ বয়সের মৌখিক রচনা থেকে ঃ

"অত্যাচারের প্রতিশোধ আমার নেওয়া নাইবা হবে
আমার পরে আসবে যাঁরা, বোধ করি তাঁরাই নেবে,
হিংস্র জন্তুর ডাক থামিবে, পথের বাধা হবে শেষ,
বুক ফুলিয়ে বলে উঠব ঐ তো আমার দেশ"

হীরেন্দ্রনাথের পঞ্চনবতি বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সংবর্ধনার উত্তরে হীরেন্দ্রনাথ যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা 'শিক্ষা ও সাহিত্য'-এর জানুয়ারি, ২০০৩ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। ঐ ভাষণের শেষদিকে তিনি বলেছিলেন ঃ

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি! এই দেশ নিয়েই তো আমাদের গর্ব। তাই বলি, এতো কাজ পড়ে আছে, সে সমস্ত কাজ করতে হবে। আপনাদের কাছে আমি চাইব আমার শতবর্ষ কামনা দয়া করে কেউ করবেন না। কামনাতে কিছু হয় না। Death will come, when it will come— নিয়তি কেন বাধ্যতে। যা হবার তা হবে, কামনার দ্বারা কিছু হয় না। ততদিনই বেঁচে থাকতে চাই যতদিন, He can justify himself and to his Country.

আজকে দেশের এই দুর্গতি! আমরা সবাই এতকাল ধরে রাজনীতি করছি — আজকের প্রজন্ম যখন আমাদের জিজ্ঞাসা করে — কি তোমরা করছ— তখন আমাদের মুখ চুন হয়ে যায়। আমরা তো বার্ণার্ড শ'র মতো ঠাট্টা করে বলতে পারি না আমরা কি সব সমস্যা বুড়ো বয়সে সমাধান করে দেব? তোমরা যে বেকার হয়ে যাবে। নতুন যুগের নুতন সমস্যা তোমরা সমাধান করবে — এরকম ঠাণ্ডা করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমাদের নৈতিক সাহস নেই, আজকে হারিয়ে ফেলেছি। ইতিহাসের চাবুক ক্রমাগত খেতে হচ্ছে। সেই ১৯৪৭ থেকে আরম্ভ হয়ে আজ বাবরি মসজিদ ধ্বংস পর্যন্ত এই চাবুক খাচ্ছি। সমস্ত হচ্ছে ইতিহাসের অভিশাপ। কিন্তু কি করা যায়। মানুষ জীবনটা হলো এমন। We do not learn, we do not learn from history। কমিউনিস্ট আন্দোলনকে নষ্ট করার জন্য বিশ্বায়নী বদ্‌মাইসি চলেছে। আজকে আমাদের দেশ এবং দুনিয়া সম্পূর্ণভাবে অন্য চেহারা নিচ্ছে। ফিদেল কাস্ত্রো বা নেলসন ম্যাণ্ডেলা কথা না বললে কিছুই বুঝতে পারি না আমরা। এটাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। আমি খুব খুশি যে, বাংলা আকাদেমির অনুনয়বাবুর মতো সবাই রয়েছেন আমার পাশে, রয়েছেন বাংলা আকাদেমির সভাপতি, রয়েছেন জ্যোতি বসু, বিমান বসু প্রমুখ। সবার কাছে বলে যাই, মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে! ভারতবর্ষের ইতিহাসের সত্তাকে বিকৃত করছে যারা এবং ভারতবর্ষের মানুষকে শুধু নয়, গোটা পৃথিবীর মানুষকে বিষিয়ে দেবার যে প্রক্রিয়া এই বিশ্বায়নের মধ্যদিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, এর মধ্যে আমরা ডুবে যাচ্ছি। এর বিরুদ্ধে লড়াই করতেই হবে, করতেই হবে, করতেই হবে। তাই আমি আবার বলি, "ম্যায় রহু, ইয়া না রহু, ইস চমন আবাদ রহে।"

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি কমরেড হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা, নাতি-নাতনী ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

কমরেড হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অমর রহে।

প্রভাত এসেছে মেঘের সিংহবাহনে

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ সাম্রাজ্যশাহির অপসরণ, অর্থাৎ দেশভাগে স্বীকৃত হওয়ার মূল্য আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে ভারত এবং পাকিস্তান নামধারী দুই বিভিন্ন, স্বতন্ত্র, স্বাধীন, আনুষ্ঠানিকভাবে 'সার্বভৌম' রাষ্ট্রকে ইংরেজের 'ক্ষমতা হস্তান্তর' (Transfer of Power) ঘটার পর থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। নানা কারণে এই সুবর্ণজয়ন্তী নিয়ে উভয় দেশবাসীর মনে প্রত্যাশিত আনন্দ-উদ্দীপনার লক্ষণ নেই। বহুকাল ধরে 'ব্যর্থশক্তি নিরানন্দ জীবনধনদীন' এই দেশ খণ্ডিত স্বাধীনতার আস্বাদে নতুন 'প্রাণ'-এর সন্ধান পায় নি। ১৯৪৭-এর ১৪-১৫ আগস্ট মধ্যরাত্রে সদ্যস্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীরূপে বিখ্যাত ভাষণে জওহরলাল নেহরু 'নিয়তির সঙ্গে অভিসার' (Tryst with Destiny) বিষয়ে যে প্রতীক্ষা কল্পনা করেছিলেন, অতি রূঢ় বাস্তব যেন তাকে বিদ্রুপ করে চলেছে। উর্দু কবি মির তকি মির-এর কথা মনে পড়ে কেবল ঃ 'বুক যদি ভেঙে যায় তো 'কাবা' বানিয়ে হলটা কী? দেশবিভাগের পূর্ববর্তী, আনুষঙ্গিক ও পরবর্তী (এবং আজও বিদ্যমান) যন্ত্রণার চাপে স্বাধীনতার মতো অমূল্য সম্পদের মধ্যেও বিকট গলদ রয়ে গেছে। সাম্প্রদায়িক দ্বেষদ্বন্দ্বের বিষময় অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আজও সেই বিষের বিস্তৃতি বিপুল, এর চেয়ে মর্মান্তিক কী হতে পারে? আশাভঙ্গ আমাদের ঘটেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমরা যেন পরিমিতি বোধ না হারিয়ে ফেলি, ভারত ভূখণ্ডের রাজনৈতিক শৃঙ্খলমোচনের সুদূরপ্রসারী ঐতিহাসিক মর্যাদার অসম্মান না করি, আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বদেশবাসীর বহুযুগব্যাপী লাঞ্ছনা সত্ত্বেও অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির অপরাজেয় বৈভবকে অভিবাদন জানাতে না ভুলি। তাই সুবর্ণজয়ন্তী নিয়ে সমারোহ যথোচিত সৌষ্ঠবের সঙ্গে হোক, তবে ঢের বেশি দরকার হল সস্তা আবেগ বর্জন করে একটু গভীরে গিয়ে আমাদের আজও অচরিতার্থ মুক্তিসংগ্রামের পর্যালোচনা আর নব প্রবোধনের প্রয়াসে যথাসাধ্য প্রযত্ন।

১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ তারিখের স্মৃতি যারা বহন করে চলেছি তারা কখনও সেদিনের কথা ভুলতে পারব না। আগের দিন বিকেলেই হঠাৎ কলকাতার চেহারা একেবারে বদলে গিয়েছিল; হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর সংশয় আর কেবলই অশান্তি আর যন্ত্রণার আশঙ্কা প্রায় যেন জাদুবলে দূর হয়েছিল। আবার যেন মুহ্যমান হৃতবীর্য জনশক্তি সুপ্তোত্থিত সিংহের মতো কেশর নাড়ল। তড়িদ্‌গতিতে সারা শহর জুড়ে খবর ছড়াল যে কলুটোলায় 'বড়া মসজিদ'-এ মুসলমান হিন্দুকে 'কোল' দিচ্ছে, অদ্ভুত উদ্দীপনার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে আলিঙ্গন করছে, মিঠাই বিলানো হচ্ছে অকাতরে। দেখতে দেখতে গোটা শহর আর শহরতলি জুড়ে অভূতপূর্ব উল্লাস — আগেকার কয়েকটা অসম্ভব মাসের রুদ্ধশ্বাস মর্মবেদনা যেন আনন্দের বন্যায় মন থেকে সাফ হয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। চারদিকে কলরোল 'হিন্দু-মুসলমানকী জয়!'

১৫ই আগস্ট-এর দৃশ্য তো বর্ণনা করা যায় না আর ভোলাও যায় না। মনে পড়ছে, থেকে থেকে রবীন্দ্রনাথের বলে যাওয়া কথা ঃ 'কবে যে দুঃখজ্বালা/হবে রে বিজয়মালা/ঝলিবে অরুণ রাগে নিশীথরাতের কাঁদা'। অহোরাত্র আবালবৃদ্ধবনিতা যেন তখন পাগল; কলকাতার রাজভবন, যা ছিল শত্রুপুরী, সাধারণ মানুষের কাছে চিরকালের 'নিষিদ্ধ এলাকা', সেখানে অবাধ জনস্রোত! বোধহয় আমার প্রয়াত বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম যে আনন্দের জোয়ারে ভেসে সুশোভন সরকার মহাশয়ের মতো দেশবিশ্রুত আর স্বভাবত লাজুক বিদ্বান উল্লসিত জনতার অনুসরণে লাটবাড়ির 'রেলিং' টপকে ঢুকেছিলেন, ভিড়ের ধাক্কার ভিতর নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। জলস্রোতের মতো সেদিনের জনস্রোত সর্বত্র। তখন যেন সবাই ভুলেছি আসন্ন দেশভাগের দুঃখ, মন থেকে ঝেড়ে ফেলেছি বছর জুড়ে পরস্পর হানাহানির স্মৃতি, আর বুক ভরে রেখেছে এক অনাস্বাদিতপূর্ব অহংকার ঃ আমার দেশ তো আজ স্বাধীন!

নিজেরই পুরোনো একটা লেখার একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ "উপেন বাড়ুজ্যে মশায়ের কাছে গল্প শুনেছিলাম কে যেন একবার জিজ্ঞাসা করে দেশ স্বাধীন হলে তিনি কি করবেন, আর তাঁর জবাব ছিল ঃ 'প্রথমেই একচোট দৌড় দিয়ে

আসব যতটা পারি, তারপর খাব যতগুলো পারি রসগোল্লা, তারপর লম্বা ঘুম, তারপর জানি না কি করব!' ৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট অনেকটা আমাদেরও সেই অবস্থা। ১৬ তারিখে বোধহয় সবাই মিলে মস্ত মিছিলে গেলাম বেলেঘাটায়, গান্ধিজির কাছে। ১৭ই বোধহয় ছিল ঈদ, ময়দানে হিন্দু-মুসলমান ভ্রাতৃভাবের প্রাণোচ্ছল দৃশ্য। ১লা সেপ্টেম্বর হঠাৎ আবার তার কেটে গেল। কিন্তু জনতার শুভবুদ্ধি আর মহাত্মার উপস্থিতি সংকটকে জয় করল, বিপদ দূর হল।" চক্রান্তের চাপে আর আমাদের পাপে স্বাধীনতা যতই বিড়ম্বনাদুষ্ট হোক না কেন, দুশো বছরের গ্লানি যে আগেকার মতো নোংরা বোঝা আর আমাদের বুকে চেপে বসতে পারে নি, এ-ঘটনা তো কম মহার্ঘ নয়। আর রবীন্দ্রনাথই দিয়ে গিয়েছিলেন অভয়বাণী — 'সকল শঙ্কা জয়' করে জীবনের 'ডঙ্কা' বাজাতে হবে 'সুপ্রভাতে' ; অন্ধকার দেখে ভয় পাওয়া চলবে না — বিপদ দল বেঁধে আসে আসুক, রাত তো ভোর হয়েছে ঃ 'ভালোই হয়েছে প্রভাত এসেছে, মেঘের সিংহবাহনে।'

আমরা যারা নিজেদের কমিউনিস্ট বলে পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করে এসেছি তাদের হয়তো খোঁটা শুনতে হবে যে 'ক্ষমতা হস্তান্তর'-এর কয়েকমাস পরেই, সদ্যপ্রাপ্ত স্বাধীনতার উদ্দীপনা পরিত্যাগ করে আমরা আওয়াজ তুলেছিলাম ঃ 'য়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়, ভুলো মৎ ভুলো মৎ'। আর 'সরিগলি সরকারকো এক ধক্কা আওর দো' ধ্বনি নিয়ে পথেঘাটে ঘুরেছিলাম। ঘটনাটা অস্বীকার করছি না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলব যে আমাদের বক্তব্য একেবারে, সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে, অবান্তর ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রধানত সোভিয়েতের শৌর্য ও সংকল্পের জোরে ফ্যাসিজম পরাস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপরিস্থিতিকে আবার প্রগতির পথ থেকে সরিয়ে রাখার প্রবল প্রচণ্ড মার্কিন নেতৃত্বে জগৎজোড়া অভিযান আর চক্রান্ত যখন তুঙ্গে, আর নানা কারণে ভারত সরকারের পুরোপুরি না হলেও বেশ খানিকটা ঢলে পড়ার আশঙ্কা প্রকট (১৯৪৯ সালেও জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো ব্যক্তিকেও নেহরু সরকারের নীতিকে ফ্যাসিস্ট আখ্যা দিতে দেখা যায়) তখন দেশবাসীর পক্ষ থেকে প্রতিরোধ-প্রচেষ্টার যে প্রয়োজন ছিল তা নিশ্চয়ই বলা যায়। আমরা ভুল করেছিলাম ইতিহাসের দ্বৈত প্রকৃতি, তার দ্বন্দ্বমূলক ('ডায়ালেক্টিক') স্ববিরোধী চরিত্রকে ঠিকভাবে ধরতে না পেরে। তর্কশাস্ত্রের 'ধ্রুপদী' নীতি অনুসারে 'A' হল A, আর সঙ্গে সঙ্গে not not=A কিন্তু ডায়ালেক্টিক লজিক বলে যে সতত-সঞ্চরমান পরিবর্তনশীল এই সংসারে 'A' একই সঙ্গে 'A' এবং 'not-A'। এই যুক্তি অনুযায়ী বিচার আমাদের উপমহাদেশে যে 'আজাদি' এসেছিল দেশকে ভেঙে (আর নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানকে সাম্রাজ্যশাহির কব্জায় প্রায় যেন এক 'টাইম'-বোমার মতো বসিয়ে যে কোনো সময়ে দরকার মতো ভারত রাষ্ট্রকে বিপন্ন করার অবস্থায় রেখে) সেই আজাদি কিছু পরিমাণে বুজরুকি আর ভাঁওতা তো বটেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বযুদ্ধ শেষে গোটা দুনিয়ার ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আর আমাদেরই অন্তর্দ্বন্দ্বে অবসন্ন অথচ মুক্তিকামী দেশবাসীর মনে নতুন আবেগ আর চেতনার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে যে বিপুল সম্ভাবনাময় পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছিল সেদিক থেকে চিন্তা করলে 'আজাদি' পুরোপুরি 'সচ' না হলেও 'ঝুটা' ছিল না। 'ডায়ালেক্টিক' চিন্তায় বহু পরিমাণে অনভ্যস্ত আর অস্বচ্ছ হওয়ার ফলে আমাদের ১৯৪৮ সালে সিদ্ধান্ত ছিল এক-দেশদর্শী। এজন্য একপেশে প্রচার আর কর্মসূচির অনুসরণে সাফল্য হল অল্প, আর সদ্যস্বাধীন দেশের জনশক্তিকে যথাযথভাবে জাগাতে আমরা পারলাম না। কঠোর জটিল পরিস্থিতিতে এমন ভুল আশ্চর্য ছিল না, তবু আমাদের সিদ্ধান্ত যে কিছু পরিমাণে সংগত ও স্বাভাবিক ছিল তার পরিচয় পাওয়া গেল ১৯৪৫ থেকে প্রায় পাঁচ বছর ধরে তেলেঙ্গানা অভ্যুত্থানের মতো জাজ্বল্যমান সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। আজও সেদিনের ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় রয়েছে অনেক কিছু। কিন্তু বিপ্লব ব্যাপারে শুধু অর্বাচীন নয়, কিছু পরিমাণে অনীহাগ্রস্ত ও গভীর চিন্তা ও কর্মব্যাপারে অনভিজ্ঞ আমাদের নেতৃত্বকে অচিরে ব্যর্থতা স্বীকার ও যথাসাধ্য সংশোধনপ্রয়াসে নামতে হল। আশ্চর্য নয়, কারণ আমাদের মতো জটিল, মান্ধাতা সমাজ অনুশাসনের দিক থেকে প্রধানত 'মনুবাদী' (প্রচলিত শব্দটির সার্থকতা অনস্বীকার্য)। আর দুনিয়ার সবচেয়ে চতুর সাম্রাজ্যবাদী শাসনে হৃতবীর্য, স্বার্থপরায়ণ লঘুচিত্ত, অদূরদর্শী শিক্ষিত শ্রেণির প্রাধান্যে বিকৃত নেতৃত্বে বিপ্লবী মানসিকতা আর স্থিতধী বিবেচনাশক্তির সমাবেশ অসম্ভব থেকেছে।

শুধু নিজের দেশের কথা বলছি না ; ঐতিহাসিক কারণেই সব দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন আজও এজন্যই বাঞ্ছিত সাফল্য পায় নি, আর অধুনা প্রতিবিপ্লবের স্পর্ধিত আধিপত্যকে প্রায় নিরীহ ভঙ্গিতে বরদাস্ত করতে বাধ্য হয়েছে। এরই মধ্য দিয়ে আজও সবাই চলেছি। যে-স্বাধীনতা এসেছে ভারত ভূখণ্ডে, তা কতকটা প্রথম থেকেই বিকৃতিদোষদুষ্ট, আর অধুনা তো ব্রীড়াহীনভাবেই বিশ্বের ধনশক্তির সঙ্গে তার নয়া 'Subsidiary Alliance' ('অধীনতামূলক মৈত্রী') অবলীলাক্রমে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে।

কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে এতটা ঘোরালো কায়দায় স্বাধীনতাপ্রাপ্তির আলোচনায় নেমে লাভ নেই, কিন্তু আমার অজুহাত হল এই যে লিখতে বসে সেদিনের অনেক স্মৃতি (আর সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী ঘটনা) ভিড় করে আসছে, যার যথাসাধ্য সংক্ষিপ্ত পরিচয় না দিতে পারলে মনের মধ্যে জমে-থাকা অনেক বেদনার উপশম নেই। তাছাড়া সকলের পক্ষেই হয়তো বিষয়টি নিয়ে চিন্তাব্যাপারে কিছু পরিমাণে সহায়তা মিলবে।

আবার বলি যে অনিবার্য কারণে কতকটা খণ্ডিত হলেও আমাদের মতো দেশের স্বাধীনতা এমনই মহার্ঘ যে তা নিয়ে হিসাবনিকাশ করতে বললে শুধু বিরক্ত নয়, বিচলিত আর ক্রুদ্ধ হতে হয়। জগৎসংসারে একেবারে নিখুঁত বলে কিছু নেই আর কালিক প্রভাবে ও সারা দুনিয়ার শক্তিবিন্যাসের চাপে স্বাধীনতার প্রকৃত নীতিসিদ্ধ সার্বভৌম রূপ সর্বত্রই দুর্লভ শুধু নয়, প্রায় অদৃশ্য। তাই যখন আজও কারও কারও মুখে শুনতে হয় যে ইংরেজ আমলে সবাই এখনকার চেয়ে ভালো ছিলাম (কথাটা শুধু রহস্য নয়, রীতিমতো গুরুতর চিন্তার জোরে উচ্চারিত হতে শোনার দুর্ভাগ্য হয়েছে) তখন রুষ্ট না হয়ে চলে না। 'Balance Sheet of Independence' রচনার জন্য পঁচিশ বছর আগে অনুরুদ্ধ হয়ে প্রকুপ্ত বোধ করেছিলাম। প্রায় সবকিছুই যখন 'আপেক্ষিক' ('relative'), তখনও ধ্রুব বস্তু ('absolute') বলে কিছু আঁকড়ে ধরার মতো থাকে। ভারত ভূখণ্ডের বিভক্তি-বিড়ম্বিত স্বাধীনতার মূল্য নিয়ে 'হিসাবনিকাশ' কেমন করে সম্ভব জানি না। জানি 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে/কে বাঁচিতে চায়' (যা ১৮৫৮ সালে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন)। ভুলি না 'স্বভাবকবি' বলে অবজ্ঞাত ও অবহেলিত কবি গোবিন্দ দাস-এর যন্ত্রণা : 'স্বদেশ স্বদেশ করিস তোরা/ এদেশ তোদের স্বদেশ নয়'। হয়তো আজকের পাঠকরা বুঝবেন না, কিন্তু হঠাৎ মনে আসছে ১৯৩০ সালে লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া স্টেশনে একটা ঘটনা যা ধক্ করে যেন বুকে আঘাত দিয়েছিল আর 'ধরণী দ্বিধা হও' ভাবিয়েছিল। যাচ্ছিলাম কন্টিনেন্টে বলে বোটট্রেন ধরার সময় স্টেশনে 'চেকার' আমার পাসপোর্ট দেখার সময় হয়তো খুব ভালো মনেই বলেছিল : 'Ah, a British passport! with this passport, my boy, you'll be safe anywhere!' কেউ কেউ উদ্ভট মনে করতে পারেন কিন্তু যন্ত্রণা পেয়েছিলাম যে পরাধীন দেশের মানুষ বলে আমাকে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান প্রজার পরিচিতি নিয়ে দেশভ্রমণ করতে হচ্ছে। খাঁটি ভারতীয় অধিকার আমার নেই। আরও মনে পড়ছে ১৯৩৪ সালের আগস্ট মাসে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের টাটকা চাকরি ঘুচে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল কারণ বিলাতের প্রসিদ্ধ পত্রিকা 'New Statesman and Nation'-এ ইংরেজ শাসনের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলাম যে বছর পাঁচেক ইংল্যাণ্ডে কাটিয়ে সে দেশটা আর সেখানকার বেশ কিছু মানুষকে কত ভালো লেগেছে অথচ 'I cannot help hating with all the hate of which I am capable the abominable relationship of our two countries today' (আমার পক্ষে যতদূর ঘৃণা সম্ভব, ততটাই ঘৃণা পোষণ করি এই দুই দেশের সম্পর্ক বিষয়ে)। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতিতে বিশাখাপত্তনমের জেলাশাসক (উড্ নামক সাহেব) চেয়েছিলেন আমাকে বরখাস্ত করা হোক, কিন্তু উপাচার্য ছিলেন রাধাকৃষ্ণন যাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতির জোরে তিনি সাহেবকে নিরস্ত করেছিলেন। এরই সঙ্গে মনে আসছে ১৯৪১ সালের নভেম্বরে ফ্যাসিস্ট আক্রমণে চূড়ান্ত বিপন্ন সোভিয়েতভূমির সমর্থনে আমি না লিখে পারিনি যে অনেকেরই মতো আমার মনের সবচেয়ে গভীর আকাঙ্ক্ষা হল আমার দেশের মুক্তি — সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিয়েছিলাম যে আমাদের মতো দেশে পূর্ণস্বাধীনতা সবচেয়ে আন্তরিক সমর্থক বলে সোভিয়েতকে নিজের দেশের মতো গণ্য করি। কেউ কেউ তখনই আমাকে এ নিয়ে বিদ্রুপ করলেও আমি এ কথা না বলে পারিনি। মাত্র কিছুকাল আগেও কারা যেন প্রশ্ন করেন, জীবনের সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছি কোন্ ঘটনা থেকে, তখন জবাব দিয়েছি এ ধরনের প্রশ্ন বড়ো জটিল, তবু বলব আমার দেশ যখন স্বাধীন হল, তখনই পেয়েছি সবচেয়ে বেশি সুখ।

হয়তো বিরক্তি সঞ্চার করছি পিছনে তাকিয়ে, কিন্তু জানাতে চাই ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট কলকাতায় একটি সভার কথা। সেদিন অহোরাত্র উল্লাস চলেছিল শহরের সর্বত্র। কয়েকটি সভায় বক্তৃতা করতে হয়েছিল, যার মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় (আমার কাছে) একটি, যেখানে বহুজনসমক্ষে বলেছিলাম ভবানী সেন আর সৈয়দ বদরুদ্দোজা-র সঙ্গে। কমিউনিস্ট নেতা ভবানী সেন ১৯৪৮-৫০-এ বি টি রণদিভের প্রায় দক্ষিণ হস্তরূপ ছিলেন, উগ্রসাম্যবাদী পথের বক্তা ও সংগঠক ছিলেন। বদরুদ্দোজা সাহেব একদা কংগ্রেসে থাকার পর মুসলিম লিগের সঙ্গে পুরো সম্পর্কিত না হলেও কতকটা সন্নিকট ছিলেন। বাংলা, উর্দু, ইংরেজিতে অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। এঁদেরই সঙ্গে একমঞ্চ থেকে ওই শুভদিনে তালতলা পল্লির হিন্দু-মুসলমান মিশ্র সমাবেশে আমাকে

বলতে হয়েছিল। এত কথার প্রয়োজন এজন্য যে সেদিন অন্তত আমাদের হর্ষোদ্দীপ্ত মন ভরেছিল পরাধীনতার অবসান সংগঠনের বিমল আনন্দে। দেশ খণ্ডিত হচ্ছে জেনেও সবকিছু ছাপিয়ে উঠেছিল ইংরেজের সাম্রাজ্যশাহির জগদ্দল পাথর বুক থেকে সরে যাওয়ার আনন্দে। দু-শো বছরের পরাধীনতার সমাপ্তি আর জগৎজুড়ে মুক্তির যুগ আবির্ভূত হওয়ার স্পষ্ট সংকেত তখন মনকে মাতিয়েছিল। পরবর্তী ঘটনাস্রোত যাই হোক না কেন, নিজেদের ধিক্কার দেওয়ার যতই কারণ ঘটে থাকুক না কেন, ভারত ভূখণ্ডের শৃঙ্খলমুক্তি সামান্য ব্যাপার নয়।

সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বিঘোষক ফরাসি বিপ্লবের মতো জগৎ কম্পনকারী ঘটনার পর দু-শো বছরেরও বেশি কেটে গেলেও প্রকৃত গণতন্ত্র যে আজও সুদূরপরাহত তাতে সংশয় নেই। ১৯১৭ সালে সোভিয়েত বিপ্লব আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে দুনিয়ার এক-তৃতীয়াংশে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য সত্ত্বেও শোষণমুক্ত সমসমাজের প্রতিষ্ঠা আজও কত বিম্বিত, কত অসাফল্যের সম্মুখীন, তা সবাই জানি। ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যশৃঙ্খলমোচনের মতো ঘটনাকে তাচ্ছিল্য করি কেমন করে! আজও দেশে ও দেশান্তরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইতিহাসের এক অশুভতম শক্তি ফ্যাসিজম-এর পরাজয় যে মানুষের জীবনে নতুন সংকেত এনেছিল তা নানা কারণে ম্লান হয়েছে দেখে নিরাশ হব কেন? উষাকালেই তমসার লক্ষণ অবশ্য ছিল আর নানা কারণে তার বিস্তৃতিকে রোধ করা আজও যায় নি। কিন্তু নব অরুণোদয় তো ঘটেছে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে। পূর্ণ সার্থকতা মেলেনি বলে পঞ্চাশ বছর আগেকার জাজ্বল্যমান দিনটি স্মরণ করে আমাদের দেশাভিমান প্রবুদ্ধ কেন হবে না?

'Humanity through nationality returns to bestiality' — এমন কথা বহুদিন ধরে শোনা গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতো পুরুষোত্তম 'ন্যাশনালিজ্‌ম্‌' বিষয়ে তাঁর বিস্বাদ ও শঙ্কা প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। কিন্তু স্বদেশমুক্তি-বিষয়ে বুক-ভরা আবেগ আর নিয়ত কর্মসংকল্প তাঁর মধ্যে যা দেখেছি তার তুলনা কোথায়? কোথায় যেন হারিয়ে গেছে আমাদের দেশাত্মবোধ, যখন দেখি সবাই অসাড় দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন বিষয়ে অমার্জনীয় শৈথিল্যে কিংবা জাতীয় সংগীত পরিবেশনে অমার্জনীয় বিকৃতিতে। আমাদের যখন বয়স কম তখন একটা কথা ছিল দেশের কাজ বা স্বদেশি করা — পরাধীন দেশে এই 'স্বদেশি' করা মানুষগুলিই ছিলেন সকলের সম্মানার্হ। কমিউনিস্ট আন্দোলনে আজও এই 'স্বদেশি' করা মানুষদের উপস্থিতিই একটা মহৎ সম্পদ, যা আধুনিক জীবনধারার চাপে কিছু পরিমাণে বিকৃত হওয়ার আশঙ্কা মাঝে মাঝে ভাবিয়ে তোলে। এজন্যই কি আজকের হাজার বিপদের মাঝখানে পুরোনো বিস্মৃত কবি গোবিন্দ দাস-এর মতো কারও কণ্ঠ শুনি না : 'আমার তুমি জন্মভূমি/কার বা রাখো ডর?'

১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মস্কোতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত কে পি এস মেনন স্টালিনের সঙ্গে দেখা করার সময় স্টালিন তাঁকে বলেন যে ধর্মের ভিত্তিতে দেশবিভাগ একটা অবাঞ্ছিত 'আদিম' ('primitive') ঘটনা, কিন্তু ভারত কি পাকিস্তানের সঙ্গে একটা বৃহৎ 'সংঘ-সমবায়' ('confederation') সংগঠনের চেষ্টা করতে পারে না? এ বিষয়ে মেনন-রচিত 'Memories and Musings' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য। তখনকার মতো একটা জবাব মেনন নিশ্চয়ই দিয়েছিলেন, কিন্তু অতি সম্প্রতি এ বিষয়ে একটু-আধটু কথাবার্তা উঠলেও গভীর কোনো চিন্তা দেখা যায় নি, কর্মপন্থার সূচনাও লক্ষিত হয় নি। মহাত্মা গান্ধি বেঁচে থাকলে হয়তো এ বিষয়ে এগোবার চেষ্টা হতে পারত, কিন্তু অত্যুগ্র হিন্দুত্ববাদীরা তো তাঁকে বাঁচতেই দিল না। বাঁচলেও তখন তিনি আশাহত; একশো পঁচিশ বছর বেঁচে থাকার ইচ্ছা ত্যাগ করেছেন, 'স্বাধীনতা দিবস'-এ দিল্লিতে না থেকে কলকাতার উপকণ্ঠে বেলেঘাটায় ক-দিনের আস্তানা বানিয়েছিলেন। শেষদিন পর্যন্ত অবশ্য দেশবিভাগ এড়াবার চেষ্টায় লেগেছিলেন; প্রস্তাব করেছিলেন জিন্নাহ্‌-কে অবিভক্ত দেশের প্রধানমন্ত্রী করা হোক। আর নেতাদের একটা ঘরে বসিয়ে মিটমাটের শেষ প্রচেষ্টা ঘটুক; অবশেষে ক্লান্তস্বরে বলেন যে কেউ কেউ 'বিপ্লব' চাইছে 'যদি পারে তো করুক, আমি শ্রান্ত, আমার সাধ্য নেই।' এসব কথা পড়ে অনেকে হয়তো কৌতুক বোধ করবেন; তবু না বলে পারছি না। পাকিস্তানে জিন্নাহ-এর প্রথম ভাষণে সুবুদ্ধির একটু যেন সুর ছিল, জাতি-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে পাকিস্তানে সকলেরই সমান নাগরিক অধিকারের অঙ্গীকার দিয়েছিলেন, যাকে শুধু মৌখিক বাগাড়ম্বর বলে উড়িয়ে দেওয়া সহজ হলেও সমুচিত নয়। তখনও উভয় দেশের সাম্প্রদায়িক পাশবিকতার তাণ্ডব তুঙ্গে, কিন্তু আগুন নেভাবার কাজে নামা প্রায় অসম্ভব দুঃসাহসের ব্যাপার হলেও তেমন সংকল্প সবাই হারিয়ে বসেছিলেন। এখানেই বলে রাখি, এজন্য আমরা অর্থাৎ কমিউনিস্ট-সমেত বামপন্থীরা যেন বড়াই করতে না বসি, বাকি সবাইকে দোষ দিয়ে নিজেদের বাহবা দিতে না থাকি।

তুলনায় ক্ষুদ্র, হ্রস্ব শক্তি হলেও ত্রিশের দশকের শেষ থেকে আমরা দেশের রাজনীতিতে অকিঞ্চিৎকর ছিলাম না। ১৯৩৬-৪১, আবার ১৯৪৫-৪৭-এ দেশের ভবিতব্য নির্ধারণে আমাদের সম্ভাব্য শক্তি সামান্য ছিল না। তবু ১৯৪৬-এ 'The Discovery of India' গ্রন্থে জওহরলাল বিদ্রুপ করে বলতে পেরেছিলেন যে আমরা একটা 'ginger group' বই কিছু নই, অর্থাৎ রাজনীতিতে 'আদার ঝাঁঝ' একটু আনতে পারি, তার বেশি নয়। কথাটার কিছু সত্যতা ছিল, নইলে আজও আমরা গোটা দেশে নির্ণায়ক ভূমিকায় নামতে পারিনি কেন, যদিও সবাই মানে, অন্তত তুলনাগতভাবে কমিউনিস্ট ও বামপন্থী কর্মীদের চরিত্রগুণ (মনে পড়ছে স্বনামধন্য শ্রমিকনেতা 'লিবারল' এন এম যোশিকে লেখা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল-এর কথা : "আপনি বলছেন যে কমিউনিস্ট কর্মীরা অনেকেই তো 'সোনার চাঁদ' ছেলে। কিন্তু ভুলে যাবেন না যে সোনা দিয়ে ছুরিও বানানো যায়!" (কী প্রচণ্ড এই মজ্জাগত কমিউনিস্ট-বিরোধিতা!) যাই হোক, গান্ধি-নেহরু-আজাদ প্রমুখ সবাইকে দেশবিভাগ নিয়ে ধিক্কার দেওয়া অবশ্যই যায়। কিন্তু আমাদেরও আছে দায়িত্ব এ বিষয়ে 'এ আমার, এ তোমার পাপ!'

ভারত-পাকিস্তান মিলে বৃহত্তর সংঘ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়ার মতো সাহস ও সংকল্প জওহরলাল এবং তাঁর সঙ্গী নেতাদের কাছ থেকে তখন প্রত্যাশা করা যায় নি। বল্লভভাই প্যাটেল-এর মতো জবরদস্ত নেতা অবশ্য দেশভাগের মূল্য দিয়েই 'স্বাধীনতা' প্রাপ্তিতে অখুশি ছিলেন না বললে অন্যায় হবে না। 'হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা'-র (ক্ষিতিমোহন সেন-কৃত গ্রন্থের এই নাম) ক্ষেত্র আমাদের এই ভারতবর্ষ বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ প্রায় ছিল না। সংকটও তখন ছিল দারুণ; ইংরেজ সাম্রাজ্যতন্ত্রের হাতের পুতুল 'দেশীয় রাজ্য'গুলি সেদিনের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছিল। হায়দরাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি ইংরেজ প্ররোচনায় 'সার্বভৌমত্ব' চাইছিল; তাদের আকার, সম্পদ ও দৌরাত্ম্য সম্ভাবনা কম ছিল না। 'সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধংত্যজতি পণ্ডিতঃ' — এই চাণক্যনীতি অনুসরণে বহু নেতারই তাই আপত্তি ছিল না। জওহরলাল নেহরুর মনস্কামনা যাই হোক না কেন, সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জর তৎকালীন ভারতবর্ষে বিপ্লবসাধনে অসামর্থ (এমনকী অনিচ্ছাও) স্বীকার করেই তিনি ও তাঁর মতো প্রায় সবাই তখন 'ক্লান্ত', আর দেশবিভাগ রোধ করার ক্ষমতা আর মানসিক আবেগ যেন ছিল না। যে গান্ধি চিরকালই বিপ্লববিমুখ, 'the beauty of compromise' যাঁকে মুগ্ধ করেছিল, দেশবাসীকে 'অভয়' মন্ত্র শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে 'অহিংসা' পথে অটল থাকার চিন্তা যাঁকে বারবার মুক্তিপ্রাত্নকে রুদ্ধ করার পথে ঠেলে দিয়েছে, তিনিই বরং খণ্ডিত স্বাধীনতাকে মানতে পারেন নি; তারই অবশ্যম্ভাবী অনুষঙ্গে হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীকে প্রায় অসাধ্য স্বীকার করতেও পারেন নি। এজন্যই প্রচণ্ড আপত্তি সত্ত্বেও ভারত সরকারকে পাকিস্তানের প্রাপ্য পঞ্চান্ন কোটি টাকা দিতে বাধ্য করেছিলেন মহাত্মা গান্ধি, আর এই 'অপরাধ'-এর শাস্তি পেলেন 'হিন্দুত্ব'বাদী ঘাতকের হাতে। হয়তো একমাত্র তাঁরই পক্ষে চাওয়া সম্ভব হত স্টালিন-কথিত ভারত-পাকিস্তান মহাসংঘ ('confederation'), কিন্তু আজও পর্যন্ত এমন পরিস্থিতি নেই যাতে সে প্রস্তাব উত্থাপিত ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত এবং আলোচিত হতে পারে। যখন 'সীমান্ত গান্ধি' আবদুল গফ্‌ফার খান, সিন্ধুপ্রদেশের জি এম সৈয়দ কিংবা বেলুচিস্তানের আবদুস সামাদ খান-এর মতো মুক্তিযোদ্ধা জীবিত, তখনও এদিকে এগোবার চেষ্টা হয় নি। সম্প্রতি যে কারও কারও মনে এ চিন্তা আসতে শুরু করেছে, এটাই শুভ লক্ষণ।

আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন হওয়ার পূর্বেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষের সঙ্গে সমমর্যাদার কূটনৈতিক স্বীকৃতির মর্যাদা দিয়েছিল। মনে পড়ছে ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি ইউনাইটেড নেশন্‌স্-এর প্রতিষ্ঠা-সভায় সোভিয়েত বিদেশমন্ত্রী মলোটভ্ বলেছিলেন যে ভারতের প্রকৃত প্রতিনিধিরা অনতিবিলম্বে এই সংস্থার অধিবেশনে আসবেন। জওহরলালের ভগ্নি, বহুগুণান্বিতা শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত তখন দর্শকের আসন থেকে মলোটভ্-এর ঘোষণা শুনে আনন্দে অশ্রুসংবরণ করতে পারেন নি — এ কথা তাঁরই কাছ থেকে আমি শুনেছি। সোভিয়েতে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদূত হয়ে গিয়ে তিনি কিন্তু স্বচ্ছন্দ বোধ করেন নি, অস্বস্তি ভোগ করেছিলেন, আর বেশিদিন ওই কাজে টিকতেও পারেন নি। সোভিয়েতও তখন ক্রমশ ভারতের বৈদেশিক নীতি বিষয়ে সন্দিহান। ইউনাইটেড নেশন্‌স্-এর সভায় শ্রীমতী পণ্ডিতকে দেখা গেছে কাকুতিমিনতির সুরে বলতে যে প্রায় সব ক্ষেত্রেই মার্কিন প্রস্তাবে ভারত সায় দিয়ে চলেছে। কোরিয়া নিয়ে যে যুদ্ধ বাধে তার প্রথম স্তরে ভারত মার্কিন নেতৃত্ব মেনে চলেছিল। এ বিষয়ে ভারতের দোটানা মনোভাব বেশ কিছুকাল চলেছিল। ১৯৫২-৫৩-৫৪ সালে পার্লামেন্টে এ নিয়ে আমাদের বহু বিতর্কে নামতে হয়েছে নেহরু সরকারের সঙ্গে। বেশ মনে পড়ছে, একবার অর্থমন্ত্রী চিন্তামন্ দেশমুখ, মার্কিন সাহায্য পেয়ে আমরা তাঁদের

মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছি, আমাদের এই যুক্তিকে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য বলেছিলেন যে ভারত হল হাতির মতো, যে জীবটিকে খাওয়াতে অনেক সাধ্যসাধনা করতে হয়। তখনই আমরা জবাব দিই ঃ 'ঠিক কথা, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে খাওয়াবার পর মানুষ কিন্তু তাকে শিকলবন্দী করে রাখে'। 'Security Act' অনুযায়ী দুনিয়াজুড়ে মার্কিন সাহায্য যে বিপদ ঘটাচ্ছিল, তা নিয়ে চলত প্রথম পার্লামেন্টে কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে আমাদের লড়াই। আমরা এ নিয়ে জাঁক করতে পারি না, তবে হয়তো কিছু পরিমাণে আমাদের সমালোচনা সরকারকে সংযত হতে সাহায্য করেছিল। অধুনা, বিশ্বব্যাপী প্রতিবিপ্লবী আবহাওয়ার মধ্যে, যে লড়াই আমাদের করতে হবে, তা হয়তো সেদিনের অভিজ্ঞতা থেকে সাহায্য পেতে পারে।

আমাদের দেশের রাজনীতির যে দ্বৈতচরিত্র, যে অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য, যে অবশ্যম্ভাবী অসংগতি, তারই কিছু পরিচয় পাওয়া যায় স্বাধীনতাপ্রাপ্তির প্রথম দশক থেকে। সন্দেহ নেই যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা সমুজ্জ্বল দিক ছিল এই যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রগতিপ্রয়াসের সঙ্গে ভারতের মুক্তিসংগ্রাম নিজেকে গ্রথিত করতে পেরেছিল। মাঝে মাঝে কিছু বিচ্যুতি ঘটলেও এটা অস্বীকার করা অন্যায়। এরই জের টেনে ১৯৪৭ সালেই জওহরলাল নেহরু দিল্লিতে এশিয়ান কনফারেন্স ডেকেছিলেন ঃ বড্ড বেশিকাল ধরে এশিয়া আর আফ্রিকাবাসী আমরা পশ্চিমি শক্তিপুঞ্জের দরবারে উমেদারি করেছি, কিন্তু আর নয়, সে অধ্যায় সাঙ্গ হয়েছে। ১৯৫০ সালে আবার এশিয়ান সম্মেলন বসে, প্রতিনিধি সংখ্যাও বাড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে যেমন আন্তর্জাতিক ফ্যাসিজম-এর বহুরূপী দুর্বৃত্তির বিপক্ষে ভারতের তেজস্বী অবস্থান ছিল — অ্যাবিসিনিয়া, চিন, স্পেন, চেকোস্লোভাকিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামীদের মনোভাব স্মরণীয় — তেমনই যুদ্ধপরবর্তীকালে প্রগতি শিবিরের সঙ্গে আমাদের সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা ছিল কাম্য। এই ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ভারতের আন্তর্জাতিক মর্যাদা সমুন্নত থেকেছে। এজন্যই ভোলা উচিত নয় যে ভারত সরকার ১৯৪৯ সালে মহাচিনের বিজয়ী বিপ্লবের সম্পূর্ণ কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিতে অগ্রসর হয়েছিল। সোভিয়েতের পর দ্বিতীয় দেশ হল ভারত যা (মার্কিন হুমকি অগ্রাহ্য করে) নতুন চিনকে ওই মর্যাদা দিয়েছিল। পরবর্তী ব্যর্থতা যাই হোক না কেন, চিনের সঙ্গে পঞ্চশীল চুক্তি (১৯৫৫) অবিস্মরণীয়। যখন মিশর-এর জামাল আবদুল নাসের, ঘানার কোয়ামে নক্রুমা, যুগোস্লাভিয়ার টিটো, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ, চিনের চৌ-এন-লাইকে নিয়ে বান্দুং সম্মেলনে (১৯৫৫) ভারতের জওহরলাল নেহরু বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে এশিয়া-আফ্রিকার নবজাগৃতির বিঘোষণে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন, যখন হিরোশিমার (১৯৪৫) দশ বছর বাদে এশিয়া-আফ্রিকায় তার বহুযুগ ধরে আহত ও অবনমিত আত্মমর্যাদা ফিরে পাওয়ার সূচনা দেখা যায়, যখন ভারতরাষ্ট্র সমাজবাদী ধাঁচে অর্থব্যবস্থা নির্মাণের চেষ্টা আরম্ভ করে, দশমিক প্রথা প্রচলন করে মান্ধাতাপন্থী আমাদের এই দেশে, যখন শত দুর্বলতা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মূল পরিচিতি হয় যে আমরা স্বাধীনতা, শান্তি ও প্রগতির সপক্ষে সর্বশক্তি নিয়ে নামবার জন্য উদ্‌গ্রীব, তখনকার কথা ভুলে যাব কেন আমরা নেহরু সহ নেতাদের বহু বিচ্যুতি সত্ত্বেও। এটা তো ঘটনা যে জওহরলালের মৃত্যুকালে ইউনাইটেড নেশন্‌স্-এর শোকসভায় উত্তর আফ্রিকাস্থিত মরোক্কোর প্রতিনিধি বলেন যে নেহরু ছিলেন 'জগতের যে অংশে আমরা বাস করি, তাদের ন্যায়নীতির স্থপতি' ('sculptor of the ethics')। আশ্চর্য নয় যে ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ভ্রমণ সমাপ্তিকালে জওহরলাল লিখে আসেন যে সোভিয়েত দেশেই হৃদয়ের একটা অংশ রেখে যাচ্ছি। তখন নিউ ইয়র্ক টাইমস খাপ্পা হয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্য করে যে তিনি সেদেশে রেখে এসেছেন 'মস্তিষ্কের কিছু অংশ-ও' ('part of his brains also')!

১৯৫২ সালে স্বাধীন ভারতে সংবিধান অনুসারে সকলের ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত সংসদে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতির ভাষণ-বিষয়ে বলা হয় যে এটা যেন দেশবাসীর বিপক্ষে যুদ্ধঘোষণা। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই প্রধানমন্ত্রী নেহরু ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন যে তাই যদি হয় তো 'there is war between them and us'। অর্থাৎ কমিউনিস্টদের সঙ্গে কংগ্রেসেরও যুদ্ধ চলবে। এটা স্মরণও করছি, বিশেষ করে এজন্য যে ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ কলঙ্কিত স্বাধীনতাকে যথাসম্ভব সার্থক করার জন্যই, এবং আমাদের ব্যর্থতাকে পরাস্ত করার মনোবৃত্তি নিয়েই কমিউনিস্ট পার্টি ও তার বন্ধু ও সহায়করা সচেষ্ট হতে চেয়েছে। এজন্যই স্বাধীনতা অর্জনকালেই যে গোড়ায় গলদ থেকে গিয়েছিল সেদিকে নজর রেখেই (হয়তো যথেষ্ট প্রস্তুতি বিনাই) আমাদের পক্ষ থেকে কতকটা অসময়ে আজাদিকে ভুয়ো বলে লড়াইয়ের আওয়াজ তোলা হয়েছিল। একে পুরোপুরি ভুল বলব না, কারণ বাস্তবিকই বিপদ ছিল যে এদেশ মার্কিন সাম্রাজ্যতন্ত্রের কুক্ষিগত হয়ে পড়ছে। (এ বিপদ আজ নবরূপে প্রকট) দাবি করতে পারি যে অন্তত

কতকটা আমাদের প্রতিরোধের চাপেই আমেরিকা আর তার অনুগতেরা পরিপূর্ণভাবে তখন কুক্ষিগত করতে পারেনি এদেশকে। এটাই আমাদের ভূমিকা — বর্তমান গুণগতভাবে পরিবর্তিত বিশ্বপরিবেশে এটাই ভিন্ন পরিচ্ছেদে আমাদের ভূমিকা। 'ইতিহাসের অবসান' ঘটেছে 'ইডিয়লজির অন্ত' এখন দেখেছি। এধরনের পণ্ডিতি বাক্য আমরা শুনেছি, 'democracy' বা গণতন্ত্রের জয়গান চলছে অথচ জনজীবনের পবিত্র গণতন্ত্র বলে কোনো বস্তু নেই শোষণভিত্তিক সমাজে। ভোগসর্বস্ব, পিশাচস্বভাব, লোভলোলুপ, সমবেদনারহিত, সদা স্বার্থসন্ধানী, অমানবিকতা রোধের সংকল্পে স্থির হয়ে সংগ্রামের প্রস্তুতি তাই আজকের মূল কর্তব্য ও দায়িত্ব।

আজ শুধু কংগ্রেস, লিগ ইত্যাকার নেতাদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে তুষ্ট না থেকে উচিত হল নিজেদেরই ব্যর্থতার পর্যালোচনা। আমাদের সকলের দোষেই স্বাধীনতা, মৈত্রী, সাম্যবাদ, প্রগতি প্রভৃতি অন্বিষ্ট সর্বদেশে কমবেশি বিপন্ন। কিন্তু বিপদ কাটাতেই হবে, ভারতবর্ষের মতো সুপ্রাচীন দেশের যুগ যুগ ধরে নির্মিত ও লাঞ্ছিত অথচ কেমন যেন অপারগ মানুষকে নিয়েই লড়তে হবে, প্রকৃত স্বাধীনতা ও সর্বজনের স্বস্তি জয় করে নিতে হবে।

বিষয়ে গুরুত্বের অনুপাতে একেবারে অসম্পূর্ণ এই রচনা শেষ করার আগে একটা খেদের কথা উল্লেখ না করে পারছি না। দুঃখিনী ভারতমাতা যুগ যুগ ধরেই সন্তান-সন্ততিদের কাছ থেকে যে ভালোবাসা প্রাপ্য ছিল তা পায় নি। সমুদ্রের উত্তরে আর হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত এই ভূভাগ বিষয়ে প্রাচীনকাল থেকেই মমতা প্রকাশ পেয়েছে কবিকণ্ঠে। কালিদাস-এর অনবদ্য কল্পনায় নগাধিরাজ হিমালয় বিষয়ে বলা হয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম সাগরে অবগাহন করে সেই পর্বতরাজি যেন পৃথিবীর মানদণ্ড রূপে বিরাজ করেছে। ভারত মানুষকে আপ্লুত করে রেখেছে। 'গঙ্গা-মৌক্তিক-হারিণী' 'দেব' নির্মিত এই দেশের বন্দনা বহুকাল ধরেই চলেছে। কিন্তু কোথায় যেন ঘাটতি থেকে গেছে। আর তারই জের টেনে আজ দেখা যায় যে বর্তমানে বিদেশে বসবাসী ভারতীয়ের সংখ্যা কোটিকে অতিক্রম করা সত্ত্বেও স্বদেশের কল্যাণে মহাচিনের বিদেশবাসীর তুলনায় এই ভারতীয়দের অবদান একেবারে অকিঞ্চিৎকর। অন্তত দুজন nobel পুরস্কারপ্রাপক মার্কিন দেশকে ভারত দান করেছে — চিকিৎসাবিদ্যায় খুরানা আর গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানে চন্দ্রশেখর (প্রবাসী ভারতীয়দের স্বদেশচেতনা, ব্যতিক্রম সত্ত্বেও, এমনই নিষ্প্রভ যে তার আলোচনায় অনীহা এসে যায়)।

প্রগতিশীলতার দাবি যাঁরা করে থাকেন তাঁদের অনেকেরই ক্ষেত্রে স্বদেশাভিমান যেন কুণ্ঠিত। নিজের দেশকে ভালোবাসার মতন সুগভীর স্বাভাবিক আবেগ যেন তাঁদের অনেককে অপ্রতিভ বানিয়ে দেয়। হয়তো ভুল করছি। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্বের একটি ঘটনা আমাকে আঘাত করেছিল আর তা সহজে ভুলতে পারছি না। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে অযোধ্যায় রামজন্মভূমি দখল করতে গিয়ে ধর্মের নামে অধর্মের চূড়ান্ত যখন দেখা গিয়েছিল পাঁচশো বছরের পুরোনো মসজিদ ধ্বংসের মধ্যদিয়ে। তার কিছু পরে প্রগতিশীল সংস্থার পক্ষ থেকে স্বাধীনতা দিবসে (১৫ই আগস্ট) একটি মনোরম অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছিল। খবরের কাগজে পড়লাম যে অনুষ্ঠানটি আরম্ভ হয়েছিল জওহরলাল নেহরুর বিখ্যাত বক্তৃতা 'Tryst with Destiny' (নিয়তির সঙ্গে অভিসার) দিয়ে। কিন্তু রাম-সীতার সম্পর্ক নিয়ে একটি ইতিহাসভিত্তিক প্রদর্শনী (যেটি স্থান-কাল-পাত্র বিচারে অযোধ্যায় প্রায় অবান্তর এবং দু-চার জনের কাছেই মূল্যবান) অকারণে অসময়ে বিতর্ক আর বিতণ্ডার উদ্ভব ঘটিয়ে সমগ্র অনুষ্ঠানটিরই তাৎপর্য ম্লান করে দিল। সাম্প্রদায়িক অশুভ শক্তিকেই সহায়তা জুগিয়ে দিল। আমার এ কথা সবাই মানবেন না জানি। শুধু আমি ভাবি। আজও ভাবি, যে অনুষ্ঠানের উদ্যোগ যাঁরা করেছিলেন (তাঁরা অনেকেই আমার বন্ধু) কেন যে ভাবলেন না যে 'Tryst with Destiny' ভাষণটির পরেই কেন অযোধ্যার মতো স্থানে শোনানো গেল না বাল্মীকি রামায়ণ থেকে উদ্ধৃত :

'ইয়ং স্বর্ণময়ী লঙ্কা/ন মে লক্ষ্মণ রোচতে/জননী জন্মভূমিশ্চ/স্বর্গাদপি গরীয়সী' ?

মধ্যরাত্রের ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে জননী আর জন্মভূমির গৌরব স্বর্গের চেয়ে বেশি, স্বয়ং রামচন্দ্রের এই বাক্য উচ্চারিত হলে অযোধ্যার পুণ্যভূমিতে আবার সদ্‌বুদ্ধি ও স্বদেশাত্মবোধের পথে টেনে আনতে সহায় হত না ?

পরিচয়-এর সঙ্গে ষাট-বাষট্টি বছর ধরে মাঝে মাঝে একটু যেন দূরত্ব সত্ত্বেও যে আত্মীয়তাবোধ করে এসেছি তারই ভরসা এই প্রায়-এলোমেলো কতকগুলি চিন্তা আজকের উপলক্ষে লিখলাম। শেষ করছি পুরোনো দিনের কথা ভেবে, যখন আমাদের ছেলেবেলায় যাঁরা স্বদেশি করতেন তাঁদের দিকেই তাকিয়ে থাকতাম, দেশকে ভালোবাসার প্রথম আস্বাদের সন্ধান পেতাম। বেশ কিছু কাল ধরে বারবার মনে আসে স্বভাবকবি বলে চিহ্নিত (এবং বিস্মৃত) গোবিন্দ দাস-এর লেখা :

'এদেশ যাদের অধিকারে/তারাই তাদের বলতে পারে/ কুকুরমেকুর ছাগল কবে দেশের মালিক হয়/তাদের কালে তোরাই কুলি/তারাই নিচ্ছে টাকাগুলি/তোদের কেবল ভিক্ষার ঝুলি/ক্ষুধায় মৃত্যু ভয়/তারাই রাজা, তারাই বণিক, তারাই সমুদয়/স্বদেশ স্বদেশ করিস তোরা এদেশ তোদের নয়।'

অধুনা আমাদের অগণিত কবিকুল একান্ত নিবিষ্ট রচনা নইলে তুষ্টি পান না ক্ষতি নেই তাতে, কিন্তু অন্তত মাঝে মাঝে কি তাঁরা (রবীন্দ্রনাথেরই মতো) জ্বলে উঠবেন না, দেবেন না নজরুলের মতো হায়দারি হাঁক, জেরিকো-র দরজা ভাঙার মতো তূর্যধ্বনি তুলবেন না? বিরক্তি উৎপাদন করছি আশঙ্কা সত্ত্বেও তাই গোবিন্দ দাস-এর গান দিয়ে শেষ করি ঃ

'আমরা হরিহর/পশুপক্ষী তরুলতা ভারতে যে আছে যথা/অণু বেণু কীটপতঙ্গ জঙ্গম স্থাবর/কামার কুমোর জোলা তাঁতি/হাড়ি মুচি সকল জাতি/মুনি ঋষি গরিব দুঃখী রাজা রাজেশ্বর/নাইকো নীচ নাইকো উচ্চ/ নাইকো প্রধান নাইকো তুচ্ছ/কোরাণ পুরাণ জেন্দাভেস্তা সবাই একত্তর/ভাই ভগিনী তিরিশ কোটি/আমরা যদি জেগে উঠি/আমার তুমি জন্মভূমি কার বা রাখো ডর?'

[যুগের যন্ত্রণা ঃ প্রত্যয়ের সংকট (স্বদেশ স্বকাল সাহিত্য সমাজবিষয়ক একগুচ্ছ নিবন্ধ) ❐ লেখক ঃ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এই পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত প্রবন্ধটি প্রয়াত কমরেড হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে 'শিক্ষা ও সাহিত্য' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত করা হল।

সম্পাদক, শিক্ষা ও সাহিত্য]

পেনসন সেল

শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সদস্যগণকে সার্ভিস বুক ও পেনসন সংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়া হয়

সপ্তাহের কাজের দিনগুলিতে
বেলা ২-৩০ মিনিট থেকে ৫-৩০ মিনিট পর্যন্ত
পেনসন সেলের কাজ করা হয়

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস — মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবার

সাধারণ সম্পাদক
নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি
সত্যপ্রিয় ভবন
পি-১৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-১৩

আজকের শিক্ষা আন্দোলনের অভিমুখ

অমল ব্যানার্জী

বর্তমানে সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কিছু নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে। বিগত সম্মেলনের পর গত তিন বছরে শিক্ষা আন্দোলনের সামনে নতুন বাস্তবতা হাজির। আজকের শিক্ষা আন্দোলন চাইছে নতুন অভিমুখ। যুগোপযোগী সংগঠন গড়ে তোলা এবং সঠিক রাস্তায় সংগ্রাম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণের ব্যবস্থা নেওয়ার আঙ্গিক সৃষ্টি করুক আজকের সম্মেলন।

ভারতবর্ষের জনমনে গণতন্ত্রের ভীত যথেষ্ট সবল। চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনের রায় সেকথাই প্রমাণ করল। এদেশের পুঁজিপতিরা গণতন্ত্রের বিকাশে তাদের ইতিহাস নির্দেশিত ভূমিকা পালন না করা সত্ত্বেও দেশের মানুষ ফ্যাসিবাদের আক্রমণাত্মক অভিমুখের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের দিক্‌নির্দেশ দিয়েছেন। এটা আমাদের উপলব্ধিতে নিয়ে আমাদের করণীয়টা ঠিক করতে হবে। মনে রাখতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতায় আবার ওদের অধিষ্ঠিত হতে না দেওয়াটা ছিল এবারের নির্বাচনী সংগ্রামের একটা বড় কাজ এবং তা সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে আর এস এস, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বি জে পি ও তৃণমূলীদের যতটা জনবিচ্ছিন্ন করা দরকার ছিল তা সবটা হয় নি। আজকের পরিস্থিতিতে ওদের জনবিচ্ছিন্ন করাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সমাজজীবনে যে পরিমাণে সামন্ততান্ত্রিক ভিত আছে তা গণতন্ত্রের বিকাশে বাধা সৃষ্টি করছে। এই বুনিয়াদের উপর দাঁড়িয়েই পুঁজিপতিদের একটা অংশ সাম্রাজ্যবাদের সাহায্য নিয়ে ফাটকা পুঁজির দাপট বাড়াতে চাইছে। আর সেই জন্যই তারা ধর্মপ্রাণ ও ধর্মভীরু মানুষজনের মনটাকে বিষিয়ে দিয়ে সেই ভিতের উপর দাঁড়িয়ে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ কায়েম করতে চাইছে।

ধর্মনিরপেক্ষতা হচ্ছে গণতন্ত্রের মেরুদণ্ড। তাই গণতন্ত্রের স্বার্থেই ধর্মনিরপেক্ষতা কতখানি প্রয়োজনীয় বিষয় তা আমাদের প্রতি মুহূর্তে মাথায় রাখতে হবে। ধর্মান্ধতা ও সামন্ততান্ত্রিক আচরণ ব্যক্তিজীবনে, পরিবারে, পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে এমনকি বিদ্যালয়ে এবং সংগঠনে যাতে কোনোভাবে প্রশ্রয় না পায় সতর্কতার সাথে তা দেখতে হবে। প্রয়োজনীয় পরিমাণে প্রজ্ঞার মধ্যদিয়ে এবং কোন ব্যক্তিসত্ত্বাকে আঘাত না করেই একাজ করতে হবে। ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত নয়, ধর্মান্ধতার আগ্রাসী বাতাবরণকে জনমন থেকে একেবারে উপড়ে ফেলাটাই একটা সামাজিক কর্তব্য। ধর্ম এবং রাজনীতি তথা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে একাকার না করে ফেলার বিষয়টা বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে। আর পাশাপাশি সামন্ততন্ত্র বিরোধী সংগ্রাম জোরদার করতে হবে, তবেই গণতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব। মনে রাখতে হবে 'ওরা' চুপ করে বসে নেই। ওরা চেষ্টা চালাচ্ছে ওদের ভ্রান্ত মতাদর্শ এবং মুখোশের আড়ালে ওদের সংগঠনের প্রসারের। এ প্রসঙ্গে জানাই, আমাদের সতর্ক দৃষ্টি ও গভীর জনসংযোগই পারবে ওদের বিকৃত, জনবিরোধী, অসৎ মতাদর্শের প্রভাব থেকে মানুষকে মুক্ত রাখতে। এই কাজটা হচ্ছে গণতন্ত্রকে প্রসারিত করার সংগ্রামের অঙ্গ।

কেন্দ্রে কংগ্রেস-এর নেতৃত্বে একটা জোট সরকার গঠিত হয়েছে। বামপন্থীদের এই সরকারকে সমর্থন করতে হচ্ছে। অন্তত একটা বড় বিপদ ঠেকাতেই প্রধানত এই সমর্থন। তবে একথাও ঠিক যে বামপন্থীদের সমর্থন ছাড়া এই সরকারের টিকে থাকা সম্ভব নয়। পুঁজিবাদ, সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপোষের মধ্যদিয়ে দেশকে বিশেষ এগিয়ে নিতে পারে কিনা তা তো আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যেই রয়েছে। এই ভুল পথের বিরুদ্ধে জনস্বার্থে লড়াই করেই তো বামপন্থা বিকল্প পথ দেখাতে পেরেছে। আজ কিন্তু কংগ্রেসকে বামপন্থীদের সমর্থনে সরকার চালাতে হবে। সেখানে অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচির একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। শাসকশ্রেণির প্রতিনিধিদের দল কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত এই জোট সরকারকে তা মেনে চলতে বাধ্য করতে হবে আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যদিয়ে। তাই এই কর্মসূচিকে আমাদেরকেও করতে হবে আন্দোলনের হাতিয়ার। বামপন্থীরা সঠিক অবস্থান গ্রহণ করেছে। 'বি জে পি-জোটকে কোনোভাবেই ক্ষমতায় ফিরতে দেওয়া যাবে না।' 'সরকারকে সমর্থন, কিন্তু

মন্ত্রীসভায় অংশগ্রহণ নয়, নয় শাসকজোটের শরিক হওয়া। এর মধ্যদিয়ে গণতন্ত্রকে রক্ষা ও প্রসারিত করার কাজ এগোবে।

শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তদের বিভিন্ন গণসংগঠনেরও দায়িত্ব রয়েছে এই আন্দোলনে যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করার। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সমাজকে সঙ্গে রাখার দায়িত্ব পালন করতে হবে আমাদের। পরিস্থিতির যেটুকু পরিবর্তন হয়েছে তার ইতিবাচক অভিমুখ ও নেতিবাচক দিকগুলোকে চিহ্নিত করে সংগ্রাম ও ঐক্যের পথে চলার মধ্যদিয়ে সামনের দিকে **এগিয়ে যাওয়ার বাস্তবতাকে কাজে লাগাতে হবে। মনে** রাখতে হবে 'কেন্দ্রীয় সরকারে থাকা এবং বামপন্থীদের সমর্থন পাওয়া'র বিষয়কে পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস দল কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে। ফলে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে দুর্বলতা থাকলে সমিতির সদস্যদের সঠিক পথে সংগ্রামের ময়দানে ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। তাই সমিতির বক্তব্য উপলব্ধি করে তা বোধগম্য সহজ ভাষায় সদস্যদের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। সঠিক পরিস্থিতির সামাজিক উপাদানগুলিকে বক্তব্যের মধ্যে যুক্ত করতে হবে। নতুবা যাদের সাথে জোট নয়, যাদের সাথে মন্ত্রীসভায় নেই, শুধুমাত্র তাদের সরকারকে সমর্থনের বিষয়টাকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা অনেকেই করবে এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপ সমর্থনের পাশাপাশি এই দিকটাতেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। শুধু ছকে বাঁধা কায়দায় আন্দোলন আজ যথেষ্ট নয়। সৃজনশীল কর্মসূচি আজকের পরিস্থিতির একটা বড় চাহিদা। সেদিকে সর্বস্তরের সমিতির নেতৃত্বকে যথেষ্ট তৎপর হতে হবে। বৃহত্তর গণ-আন্দোলনের পরিপূরক শক্তি হিসাবে শিক্ষা আন্দোলনকে গড়ে তুলতে হবে। গণতন্ত্র বিপন্ন হলে যে শিক্ষা বেহাল হয়, তা তো বিগত সরকার ভালো করেই বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। শিক্ষার বিষয়বস্তু-পরিকাঠামো এবং পরিচালন ব্যবস্থার গণতান্ত্রিকীকরণ আজকের একটা সবচেয়ে বড় চাহিদা। আর তার জন্য প্রয়োজন সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণের যে সমস্ত অন্যায় পদক্ষেপ এন ডি এ সরকার নিয়েছিল, সেগুলো সব এই সরকারকে দিয়ে অবিলম্বে প্রত্যাহার করানো। তার জন্য STFI-এর উদ্যোগে সর্বভারতীয় স্তরে যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে সেগুলো সমস্ত সদস্যদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে এবং লড়াইয়ে অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি, প্রথাগত ব্যবস্থাকে শেষ করে দেবার সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টার কাছে নতিস্বীকার না করা এবং দরিদ্র মানুষজনদের কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেবার জন্য আন্দোলনকে বিকশিত করতে হবে। শিক্ষা আন্দোলন শুধু শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সংগ্রাম নয় — এই উপলব্ধি থেকেই সর্বস্তরের সংগ্রামী মানুষকে এই আন্দোলনে যুক্ত করার জন্য আন্তরিক হতে হবে আমাদের। তাই আমাদেরকে বেশী বেশী করে অংশগ্রহণ করতে হবে সর্বশিক্ষা-সাক্ষরতা-বিজ্ঞান ও সমবায় আন্দোলনে। ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করতে হবে Students Health Home আন্দোলনে। NRC-এর গবেষণার কাজ দ্রুত শেষ করে প্রতিবেদন **প্রকাশ করতে হবে।**

রাজ্যে রয়েছে সীমাবদ্ধ ক্ষমতার বামফ্রন্ট সরকার। সেখানে দাঁড়িয়ে একদিকে তাকে রক্ষা করার সংগ্রামে অংশীদার হওয়া এবং জনমুখী শিক্ষানীতিকে যথাযথভাবে কার্যকরী করার সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে। পাশাপাশি এই বন্ধু সরকার তার ঘোষিত নীতি থেকে যাতে কোনোভাবে বিচ্যুত না হয় তার জন্য প্রয়োজনে শিক্ষকোচিত প্রজ্ঞা নিয়ে সতর্ক দৃষ্টি বজায় রাখতে হবে। পেশাগত অর্জিত অধিকার রক্ষা এবং শ্রেণিশিখনের মানোন্নয়নে সমিতিকে হতে হবে একনিষ্ঠ এবং আন্তরিক। শিক্ষায় মানোন্নয়নের কাজ আজকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই উপলব্ধি সদস্যদের মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে।

পেশাগত দাবি-দাওয়াকে অবহেলা করলে সংগঠন ও আন্দোলন দুর্বল হবে। আন্দোলনের মধ্যদিয়ে উঠে আসা সেরা নবীন ব্যক্তিত্বদের নেতৃত্বে উন্নীত করার প্রক্রিয়াও শিথিল রূপ নেবে। কাজেই এই ত্রুটি যাতে না ঘটে তা দেখতে হবে। তা করতে হলে এই মুহূর্তে গণসমাবেশকে আরো শক্তিশালী করবার কাজকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। পেশাগত দাবি ও পেশার মর্যাদা রক্ষার লড়াইকে উপযুক্ত গুরুত্ব দেবার মধ্যদিয়ে একাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারা যাবে। মনে রাখতে হবে, যখন প্রথাগত ব্যবস্থা আক্রান্ত তখন স্কুল বাঁচলে তবেই পেশা বাঁচবে। আর স্কুল না বাঁচলে দেশও রক্ষা পাবে না। স্কুল বাঁচাতে হলে শিক্ষার মানোন্নয়নে সমিতিকে তার ভূমিকা পালন করতে হবে। শিক্ষার মানোন্নয়নের প্রকৃত অর্থ শ্রেণিশিখনের গুরুত্বকে যথার্থভাবে রক্ষা করা। বিদ্যালয় যাতে শিক্ষার্থীর কাছে আনন্দের হয়ে উঠে তা সুনিশ্চিত করা।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রজেক্টগুলোর সুযোগ নিতে হচ্ছে রাজ্য সরকারকে নানা কারণে, সেটা একটা দিক, কিন্তু তার ভিতর লুকিয়ে আছে প্রথাগত ব্যবস্থাকে দুর্বল করা এবং

শিক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্বকে অস্বীকার করার বীজ এই দিকটা সচেতনভাবে মাথায় রাখতে হবে। এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে আমাদের চলতে হচ্ছে। এই বাস্তবতার মধ্যে দাঁড়িয়ে একদিকে পেশার প্রতি নিষ্ঠা ও দায়বদ্ধতাকে গুরুত্ব দিতে হবে আর তার সাথে সমগুরুত্ব দিয়ে সংগঠনকে আরো গতিশীল ও শক্তিশালী করার কাজ চালিয়ে যেতে হবে। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের বাইরেও পাঠদানে সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে। সুস্থ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আগ্রহী করে তুলতে হবে। এর মধ্যদিয়ে আমরা শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছে আমাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে পারবো। অন্যদিকে বৃহত্তর আন্দোলনের ময়দানে যাঁরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পট-পরিবর্তন ঘটালেন তাদেরও কাছের মানুষ হিসাবে পাবো। ফলে নিজেদের সংগ্রামী মেজাজটাকে এগিয়ে নিতে পারবো। এই পদক্ষেপ ভবিষ্যতের সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে উপাদান যুক্ত করবে। গড়ে তোলা সম্ভব হবে পরিস্থিতির উপযোগী শিক্ষা আন্দোলন। আন্দোলনের মধ্যদিয়েই গড়ে উঠবে দৃঢ় এবং ঐক্যবদ্ধ সংগঠন। ভুলে গেলে চলবে না পশ্চিমবাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থান ঐতিহ্যবাহী। শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রামের সাথে আছে সংগ্রামী মধ্যবিত্তরা। নির্বাচনী সংগ্রামে এবারের ফলাফলও প্রমাণ করেছে সংগঠিত মধ্যবিত্তরা ৭১-৯৬ শতাংশ ভোট বামফ্রন্টের পক্ষে দিয়েছে। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে শিক্ষার প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর সেমিনার, কর্মশালা ও যৌথ কনভেনশন কর্মসূচির পরিকল্পনা নিতে হবে। দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে দাঁড়ানোর চিন্তাভাবনাকে সংগঠিত রূপ দিতে হবে। বিদ্যালয় পরিচালনায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ভূমিকা সুনিশ্চিত করতে হবে।

এইসব কাজে সদস্যবন্ধুদের যুক্ত করতে হবে সংগঠনের মাধ্যমে। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সমাজের কাছে নেতৃত্ব পৌঁছুবেন সংগঠনের গণতান্ত্রিক রীতি ও পদ্ধতি মান্য করে এবং বন্ধুসুলভ আলাপ-আলোচনার মধ্যদিয়ে। তাই বিদ্যালয়ের অঙ্গনে কথাবার্তা বলা ও পরস্পরের বাড়িতে যাওয়া-আসার অভ্যাসটাকে একটু বাড়ানোর জন্য সচেষ্ট হতে অনুরোধ করছি। একাজ শুধু নির্বাচনের সময়ে করার বিষয় নয়। সংগঠনকে সজীব প্রাণবন্ত ও সক্রিয় রাখতে হলে জোনাল নেতৃত্বকে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে ইউনিটগুলোর সাথে। আর চালু রাখতে হবে দপ্তর। কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে দপ্তর থেকেই। ইউনিটের নেতৃত্বকে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে সমস্ত সদস্যবন্ধুদের সাথে। প্রতি মাসে করতে হবে অন্তত একটি সভা। ব্যক্তিগত গ্রাহক হতে হবে 'শিক্ষা ও সাহিত্য' পত্রিকার। গড়ে তুলতে হবে সুদৃঢ় ঐক্য। মনে রাখতে হবে সংহতি কার্যসাধিকা। সমিতিই আমাদের পেশার নিরাপত্তা, অর্জিত অধিকার ও পেশার মর্যাদা রক্ষা এবং প্রথাগত ব্যবস্থাকে এগিয়ে নেবার লক্ষ্যে একমাত্র হাতিয়ার। সদস্যবন্ধুদের সমিতির কাছে তাদের ন্যায্য প্রত্যাশা পূরণে যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে নেতৃত্বকে। আসুন আমরা এই বাস্তবতা তৈরী করি। গড়ে তুলুন আজকের আন্দোলনের অভিমুখ। এই অভিমুখে চলার প্রত্যয় দৃঢ় অবস্থান গ্রহণে শপথ নেবার মধ্যদিয়ে গড়ে উঠুক আগামী রাজ্য সম্মেলনের পরিপ্রেক্ষিত।

লেখকদের প্রতি অনুরোধ

- ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে।
- লেখার কপি রেখে লেখা পাঠাবেন। কোন লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- জেরক্স কপি পাঠাবেন না। জেরক্স কপি প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।
- সমিতির রাজ্য দপ্তরের ঠিকানাতে লেখা পাঠাতে পারেন।

সম্পাদক
শিক্ষা ও সাহিত্য

সময়ের অভিমুখ ঃ আমাদের কর্তব্য

অপরেশ ভট্টাচার্য্য

চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনে জনগণ ফ্যাসিস্ত বি জে পি-জোট সরকারের সাম্প্রদায়িকতা ও উদার অর্থনীতির বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক রায় দিয়েছেন। সরকারকে সংসদীয় পথে বিতাড়নের ক্ষেত্রে বামপন্থী শক্তিগুলির বিরাট ভূমিকা ছিল। বামপন্থীরাই সমগ্র দেশজুড়ে ফ্যাসিস্ত বি জে পি-জোটের শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকীকরণ, লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বিলগ্নীকরণ, গুজরাটে গণহত্যা, সন্ন্যাসিনী ধর্ষণ, যাজক হত্যা এবংবিধ নারকীয় কাণ্ডের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রচারে অংশ নিয়ে জনমত সংগঠিত করেছেন। এর ফলে নির্বাচনে একদিকে বি জে পি-জোটের পতন এবং কংগ্রেস-জোটের উত্থান। বামপন্থী দলের সর্বাধিক আসন লাভ। এখানেই শেষ নয়, কেন্দ্রে যে প্রগতিশীল মোর্চা সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে বামপন্থীরাই তার প্রধান নিয়ামক শক্তি। বামপন্থী শক্তির বিপুল সাফল্যে স্বার্থান্বেষী মহল, তাঁবেদার রাজনৈতিক ভাষ্যকার এবং বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি আতঙ্কিত। নির্বাচনোত্তর সময় থেকেই তারা বামপন্থীদের ভূমিকা নস্যাৎ করার খেলায় মেতে উঠেছে। বামপন্থীদের সরকারে যোগ না দেওয়ার বিষয়টি তুলে ধরে বিভ্রান্তিকর বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার পরিচিত খেলায় নেমেছে। সরকার ভাঙার খেলাতেও কোন কোন শক্তিকে নামতে দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যেই বামফ্রন্ট সরকার ২৮ বছরে পদার্পণ করলো। সমগ্র পরিস্থিতি পর্যালোচনার মধ্যদিয়ে আমাদের ভূমিকা কী হবে সে সম্পর্কে আলোচনা জরুরী।

চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনে বিপুল সাফল্য লাভের পর জনগণ কেন্দ্রীয় সরকারে বামপন্থী শক্তিকে দেখতে চেয়েছিলেন। প্রত্যাশা স্বাভাবিক। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার বিগত ২৭ বছরে ধারাবাহিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে সমস্ত স্তরের মানুষের মনে তার অবিসংবাদিত গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করেছে। পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ মানুষ বিশ্বাস করেন বামফ্রন্ট সরকার তাদের স্বার্থরক্ষায় অতন্দ্র প্রহরী। ২৭ বছরে এই সরকার সুনির্দিষ্টভাবে এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সাফল্য এনেছেন যা ভারতের অন্য কোন রাজ্যে ঘটেনি। ঠিক এই কারণেই অন্যান্য রাজ্যে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনে জনগণের দ্বারা নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যাত হলেও বামপন্থী দলের সাফল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধু ভারতে নয়, সমগ্র বিশ্বেই আজ পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার এক বিস্ময়। এই বিশ্বাসযোগ্যতা এবং গ্রহণযোগ্যতা থেকেই বামপন্থীদের সরকারে যোগ দেওয়ার প্রশ্নে মানুষ ইতিবাচক রায় দিয়েছিলেন। তাদের বিশ্বাস, বামপন্থী দল কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ দিলে সমগ্র দেশজুড়ে উন্নয়নের নতুন দিশা সৃষ্টি হবে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কৃষি-বিদ্যুৎ-শিল্প, পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের উন্নয়ন তাৎপর্যপূর্ণভাবে নিশ্চিত হবে। জনগণের এই প্রত্যাশাকে সম্মান দিয়েও বামপন্থী নেতৃত্ব বাস্তব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন দিয়ে যোগ দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন। এর পেছনের প্রধান তিনটি কারণ বর্তমান — ১. সমগ্র দেশে বামপন্থী শক্তিগুলি এখনো সেই অর্থে শক্তিশালী নয়। ২. অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্নে কংগ্রেসের সঙ্গে বি জে পি'র তেমন কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। ৩. কংগ্রেস জয়ী হয়েছে। বি জে পি'র প্রতি মানুষের নেতিবাচক ভোটে।

একথা সত্য যে, কংগ্রেস-জোটের অনেক কাজ নীতিনিষ্ঠ বামপন্থী শক্তির পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব। সরকারে যোগ দিয়ে সেই সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী কার্যাবলীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সমালোচনা সম্ভব নয়। সেটা হতো চরম নীতিহীন ও আত্মঘাতী কাজ। সেই কাজ বামপন্থীদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই কারণেই বামপন্থীরা সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বামপন্থীদের এই সিদ্ধান্তের পেছনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো প্রগতিশীল মোর্চা জোটের অভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এমন শিথিলতা ও অস্পষ্টতা রয়েছে যা জনস্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে পারে। এক্ষেত্রে বামপন্থীদের সক্রিয় ও বহুমুখী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন। ইউ পি এ সরকারের নীতিতে যদি জনগণের ন্যায্য স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় তাহলে সংসদের ভিতরে ও বাইরে বামপন্থীদের প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনকে মূল লক্ষ্য হিসেবে সামনে রেখে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জনগণের স্বার্থপূরণের উদ্দেশ্যে অন্তর্বর্তী কৌশল গ্রহণ বর্তমান

সময়ের অত্যন্ত জরুরী কর্মসূচি। ক্ষমতা দখল নয়, সাধারণ মানুষের কল্যাণ-উন্নয়ন সুনিশ্চিত করাই বামপন্থী দলের প্রধান লক্ষ্য। অপরপক্ষে আই এম এফ, বিশ্বব্যাঙ্ক ও মার্কিন ট্রেজারি নির্দেশিত নয়া অর্থনীতির লক্ষ্য পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠা দেওয়া। মেহনতী মানুষের সর্বনাশ সাধনের মধ্যদিয়েই এই কাজের সাফল্য নিহিত। বি জে পি-জোট সরকারের গৃহীত অর্থনীতি এই কারণেই জনগণকে অবর্ণনীয় কষ্ট দিয়েছে। যে কারণে জনগণ বি জে পি'কে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছে এবং বামপন্থীদের উপর কঠিন দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত করেছে। জনগণ ফ্যাসিবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি ও তার সর্বনাশা সংস্কার নীতির পুনরাবৃত্তি দেখতে রাজী নয়। এক্ষেত্রে বামপন্থীদের দু'টি ভূমিকা — এক, তারা পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে কেন্দ্রের ধর্মনিরপেক্ষ ইউ পি এ সরকারকে রক্ষা করবে। দুই, গৃহীত অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচির রূপায়ণ যাতে নিশ্চিত হয় সেদিকে পূর্ণ দৃষ্টি রাখবে। দেশের অর্থনীতির অভিমুখ যাতে জনকল্যাণের দিকেই নিবদ্ধ থাকে, বামপন্থীদল সেদিকে কড়া নজরদারি রাখার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ সম্পর্কে সি পি আই (এম)-এর সম্পাদক অনিল বিশ্বাস-এর মন্তব্য স্মরণীয় — 'বর্তমান পরিস্থিতিতে বামপন্থীদের জরুরী কর্তব্য হলো ইউ পি এ সরকারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থরক্ষায় নিরবচ্ছিন্ন গণ-জমায়েত সংগঠিত করা। কেন্দ্রের বর্তমান সরকারের প্রতি সমর্থন এবং নীতিভিত্তিক আন্দোলনই বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে।' (গণশক্তি, ২রা জুন, ২০০৪)

সবাই লক্ষ্য করেছেন প্রগতিশীল মোর্চা সরকারের বিদেশমন্ত্রী নটবর সিং এবং কয়লামন্ত্রী শিবু সোরেনের কার্যকলাপ। নটবর সিং-এর ঘোষণা, মার্কিন শক্তিকে মদত দিতে ইরাকে সৈন্য পাঠানোর বিষয়টি তাঁর মস্ত্রক বিবেচনা করবে। শিবু সোরেনের ঘোষণা, কোল ইণ্ডিয়া এবং ডি ভি সি'র সদর দপ্তর কলকাতা থেকে ঝাড়খণ্ডে স্থানান্তরিত হবে। কেন্দ্রের এই দুই মন্ত্রীর আচরণ আদৌ অপ্রত্যাশিত নয়। এরা যে শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে সেখানে এজাতীয় আত্মঘাতী কার্যকলাপের উদাহরণ অজস্র। বি জে পি'র সঙ্গে এদের দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য কিছু নেই। সমগ্র বিশ্ব ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হচ্ছে। আফগানিস্তান-ইরাক ধ্বংসের প্রতিবাদে বিশ্ব সোচ্চার। এই পরিস্থিতিতে ভারতের বিদেশমন্ত্রীর সাম্রাজ্যবাদকে নতুন করে মদত দেওয়ার সিদ্ধান্ত সবাইকে চমকে দেবে — সন্দেহ নেই। বামপন্থীরা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। মাননীয় মন্ত্রী বর্তমানে তাঁর পূর্ব বক্তব্য অস্বীকার করে ইতিবাচক কথাবার্তাই বলছেন। কিন্তু আগামীদিনে এজাতীয় কাজ থেকে একেবারে নিরস্ত হবেন এমন ভাবার কোন কারণ নেই।

শিবু সোরেন যা করবেন বলে জানিয়েছেন তা দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। পশ্চিমবঙ্গকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংসসাধনের জন্য বি জে পি সরকারের রেলমন্ত্রী নীতিশকুমার পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর ভেঙে দেওয়ার কাজটি ইতিপূর্বেই সুসম্পন্ন করেছেন। তারও আগে কেন্দ্রীয় মদতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে শিল্পপতিদের অন্য রাজ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুতরাং শিবু সোরেনের ঘোষণায় নতুনত্ব কিছু নেই। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, ভারতের বহুবিধ সমস্যা সত্ত্বেও শিল্পোদ্যোগগুলিতে কয়লা সরবরাহ মোটামুটিভাবে ঠিকই আছে। প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত পরিকাঠামোকে ভেঙে ঝাড়খণ্ডের মতো মাফিয়া ও উগ্রপন্থী-অধ্যুষিত, বিদ্যুতে বেহাল একটি রাজ্যে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত রাজনৈতিক দলের এহেন তুঘলকী সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া কী সম্ভব? সি পি আই (এম) তাই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শাণিত করেছে। সর্বাধিক প্রশংসনীয় ঝাড়খণ্ডের সি পি আই (এম) নেতৃত্বের পদক্ষেপ। শিবু সোরেনের এই অপচেষ্টাকে তাঁরা প্রাদেশিক সংকীর্ণতার লক্ষণ বলে ঘোষণা করেছেন। বামপন্থীদের এই জাগ্রত ভূমিকা থাকবে অটুট। আর এই কারণেই সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন দেওয়ার সিদ্ধান্ত।

সুখের বিষয়, অভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে ইউ পি এ সরকার ইতিমধ্যেই ইতিবাচক মনোভাবের পরিচয় রেখেছেন। নতুন সরকারের প্রথম বাজেটে অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচিই প্রতিফলিত হবে, এই আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। সাধারণ বাজেট ও রেল বাজেটের রূপরেখা নিয়ে প্রথমে বামপন্থীদের সঙ্গে পরে বামপন্থীসহ সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চার শরিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী। বামপন্থীরা অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি অনুসারী বাজেট তৈরীর ওপর জোর দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি — বাজেটে সি পি আই (এম)-এর নির্দেশিকাই মান্য করা হবে।

কৃষিপণ্যের জন্য একগুচ্ছ নতুন উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরম। চলতি বছরেই কৃষিঋণের পরিমাণ ২৫ হাজার কোটি টাকা বাড়ানো এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সুদ ছাড়ের কথাও ঘোষণা হয়েছে।

সি পি আই (এম) সাংসদ বাসুদেব আচারিয়া, দীপঙ্কর মুখার্জী, সি পি আই-এর সাধারণ সম্পাদক এ বি বর্ধন, ফরওয়ার্ড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত বিশ্বাস প্রমুখ

বামপন্থী নেতৃত্ব প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচিই যেন বাজেটে প্রতিফলিত হয়। তাঁরা কয়েকটি অগ্রাধিকারকেও চিহ্নিত করেছেন। সেক্ষেত্রে কৃষির কথাই সামনে এসেছে। বামপন্থী নেতৃত্বের বক্তব্য, বাজেটে ভূমিসংস্কারের উল্লেখ থাকা উচিত। কৃষিক্ষেত্রে সরকারের বিনিয়োগ বাড়ানো, সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ঋণ দেওয়া এবং গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ বাড়ানো দরকার। তাদের আরো বক্তব্য, এখনই কাজের বদলে খাদ্য কর্মসূচি চালু করতে হবে। এই বাজেটেই কৃষিমজুরদের জন্য প্রকল্প ঘোষণারও আর্জি জানান। কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার জন্য বাজেটে ঘোষণা থাকা উচিত বলেও তাঁরা মন্তব্য করেন। সি পি আই (এম) সাংসদ বাসুদেব আচারিয়া পাট ও চা শিল্পের জন্য নির্দিষ্ট সরকারী উদ্যোগ নেবার আর্জি জানান। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের পুনরুজ্জীবনের জন্য যাতে বাজেটে যথেষ্ট বরাদ্দ থাকে তার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানান তাঁরা। এন ডি এ সরকার শ্রমিকদের সম্পর্কে যে মনোভাব পোষণ করতো তা থেকে সরে আসার স্পষ্ট উচ্চারণ বাজেটে যেন থাকে, বামপন্থীরা সেই দাবীও জানিয়েছেন।

বামপন্থী দলগুলি শিক্ষাকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার দাবী রেখে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৬শতাংশ বরাদ্দের জন্য সুপারিশ করেছেন। কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুদের হার যেন কোনোমতেই কমানো না হয় সেই দাবীও তাঁরা তুলে ধরেছেন। বামপন্থী নেতৃত্বের মন্তব্য, সরকারের সম্পদ সংগ্রহের সমস্যা অনেকটাই মিটে যায় যদি কর ফাঁকি আটকানো যায়। বাজেটে সেই লক্ষ্যে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ থাকা উচিত। তাঁরা রান্নার গ্যাসের সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়েছেন। অন্যান্যদের মধ্যে সারমন্ত্রী রামবিলাস পাশোয়ান রাষ্ট্রায়ত্ত সার কারখানা পুনরুজ্জীবনের জন্য বাজেটে নির্দিষ্ট বরাদ্দের আর্জি রেখেছেন। অপরপক্ষে অর্থমন্ত্রীর আভাস, তিনি বাজেটে নির্দিষ্ট আর্থিক প্রকল্পই ঘোষণা করতে চান। রূপায়ণযোগ্য ঘোষণার বাইরে তিনি যেতে চান না।

এদিকে শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্বতন এন ডি এ সরকারের গৈরিকীকরণমুখী সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে নতুন মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী অর্জুন সিং কিছু উদ্যোগ নিলেও তা যথেষ্ট নয় বলেই মনে করেছেন শিক্ষাবিদ্ মহল। 'বিষমুক্তি'-র এই অভিযান আরও দ্রুত ও দৃঢ় হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে তাঁদের অভিমত। বিশেষত স্কুল পাঠক্রমের রদবদল, কয়েকটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ঘনিষ্ঠদের অপসারণের কাজে কালবিলম্ব না করাই উচিত বলে তাঁরা দাবী তুলেছেন। অন্যদিকে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সূত্রের বক্তব্য, অর্জুন সিং ধীরে চলতে চান। তাঁর পূর্বসূরি মুরলীমনোহর যোশী যেভাবে সব ব্যাপারে স্বৈরাচারী কায়দায় হস্তক্ষেপ করেছেন তাতে শিক্ষামহলে যথেষ্টই বিরক্তি তৈরী হয়েছে। ভালো-মন্দ যাই করুন, অর্জুন সিং নিজেকে 'হস্তক্ষেপকারী' হিসাবে দেখাতে চাইছেন না।

উল্লেখ্য, শিক্ষাক্ষেত্রের প্রায় সব স্তরেই গত ছ'বছরে পূর্ণ দখল নিয়েছিল আর এস এস। একদিকে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিতে সংঘের মনোনীত ব্যক্তিদের বসানো হয়েছিল, অন্যদিকে স্কুলস্তরের শিক্ষাক্রমে সংঘের চিন্তা অনুযায়ী পাঠক্রম চালু হয়েছিল। বিশেষত ইতিহাসকে কেন্দ্র করে তা সবচেয়ে প্রকটভাবে প্রতিফলিত হয়। সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চার অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচিতে শিক্ষার গৈরিকমুক্তির কথা স্পষ্টভাবেই বলা আছে।

অর্জুন সিং ইতিহাসের বই পর্যালোচনার জন্য তিন সদস্যের একটি কমিটি করেছেন। এতে আছেন ভারতীয় ইতিহাস গবেষণা পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এস সাত্তার, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডিজের প্রাক্তন অধিকর্তা জে এস গ্রেওয়াল ও বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ্ বরুণ দে। এই বিশেষজ্ঞদের অবশ্য বলা হয়েছে স্কুলস্তরের ইতিহাস বইয়ে 'বিকৃত ও সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতদুষ্ট' অংশ বাদ দিয়ে তার বদলে 'ছোট কিছু পরিচ্ছেদ' যুক্ত করা। যদি বিশেষজ্ঞরা সুপারিশ করেন তাহলে কেন্দ্র এন সি ই আর টি এবং সি বি এস ই-কে সেই মতো পাঠ্যপুস্তক সংশোধন করে নিতে বলবে। ইরফান হাবিব, অর্জুন দেব, সুরজ ভান, আদিত্য মুখার্জীর মতো ইতিহাসবিদ্‌দের বক্তব্য এন সি ই আর টি'র ওই ইতিহাস বই লক্ষ লক্ষ কপি ছাপা হয়েছে। উল্লেখ্য, ঐতিহাসিকগণ অনেক আগেই এই বইয়ের মারাত্মক প্রমাদ ও বিকৃতিগুলি চিহ্নিত করেছেন। অর্জুন সিং যে বিশেষজ্ঞদের দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁদের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা ও সম্ভ্রম নিয়েই ইরফান হাবিবের মন্তব্য, ওই বই আর একদিনও পড়ানো উচিত নয়। কালক্ষেপ করার অর্থ সর্বনাশ সাধনে মদত দান।

সবাই জানেন, এন সি ই আর টি'র শিক্ষাক্রমকে নিজেদের মতো ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ অনুমোদন দিতে ২০০০ সালেই রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীদের সম্মেলন ডেকেছিল কেন্দ্র। সেই চেষ্টা কার্যকরী না হওয়া সত্ত্বেও মূলত সি বি এস ই এবং অন্য পথে সেই শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক চালু করে দেয় বি জে পি সরকার। শিক্ষাবিদ্‌গণ এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধেই গত চার বছর ধারাবাহিকভাবে সোচ্চার হয়েছেন। এখন তাঁদের দাবী এই শিক্ষাক্রমটিকে দ্রুত পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে।

 Acc. no. — 16015

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ প্রভাত পট্টনায়েক বলেছেন, শুধু কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাথায় বসা লোকদের সরানোর প্রশ্ন নয়, শিক্ষাক্রমের গৈরিকীকরণ স্কুলে স্কুলে ছড়িয়েছে। এখন যত দ্রুত সম্ভব শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে দেওয়া উচিত যাতে তাঁরা এই প্রক্রিয়ার অবসান ঘটাতে পারেন

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের বিশিষ্ট অধ্যাপক অনিল সদগোপালের মন্তব্য — নিষ্ক্রিয় কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদকে দ্রুত সক্রিয় করা হোক। বর্তমানে শিক্ষা যৌথ তালিকায়। উপদেষ্টা পর্ষদে বসে রাজ্যগুলির সঙ্গে আলোচনা করে এখনই বি জে পি-রচিত স্কুলশিক্ষার জাতীয় পাঠক্রমের কাঠামোর পরিবর্তন হোক।

অর্জুন সিং-এর বক্তব্য — প্রতিহিংসার মতো দেখায় এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণে তাঁর মত নেই। ধীরেসুস্থেই যা করার করতে হবে। অধ্যাপক হাবিব এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, প্রতিহিংসার দরকার কী? কর্তব্যটুকুই করুক নতুন সরকার। স্থিতাবস্থা চলতে থাকবে বলে দেশের মানুষ নিশ্চয়ই সরকার বদল করেন নি? অনিল সদগোপালের বক্তব্য — সি এম পি-তে বলা হয়েছে, শিক্ষায় সাম্প্রদায়িক হস্তক্ষেপের প্রক্রিয়াকে বিপরীত পথে পরিচালিত করতে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। সেই দ্রুত পদক্ষেপটিই অর্জুন সিং-এর কাছ থেকে প্রত্যাশা করছি আমরা।

সুতরাং লক্ষ্য, আদর্শ পূরণ করতে গেলে বামপন্থীদের নিরবচ্ছিন্ন কাজ করে যেতে হবে। এ বিষয়ে অনিল বিশ্বাস-এর আরও একটি মন্তব্য উদাহরণযোগ্য ঃ

'সবিনয়ে এ কথাই বলতে চাই যে, কিছু মন্ত্রীর কাজ দেখিয়ে প্রচার পাওয়া যেতে পারে, হই হই সৃষ্টি করা যেতে পারে, চারপাশে কিছু মানুষের ভিড়ও জমতে পারে কিন্তু তা দিয়ে বামপন্থীরা যে ধরণের গণ-আন্দোলন ও শ্রেণি-আন্দোলন, যে বিকল্প নীতি নিয়ে চলতে চায়, সংগঠন চায় তা গড়ে তোলা সম্ভব হবে না, যদি নিচুতলার থেকে জনগণের আন্দোলন গড়ে তোলা না যায়, যদি বামফ্রন্ট আদর্শে অবিচল থেকে তার স্বাধীন কার্যক্রম না নেয় তবে কাজের কাজ কিছুই হবে না। এ কাজ কঠিন, সময়সাপেক্ষ কিন্তু এর কোনো শর্টকাট রাস্তা নেই। আদর্শে অবিচল থেকে ধৈর্য ধরে আমাদের সে দিকেই এগোতে হবে। একথা' ঠিক যে, এই মুহূর্তে তৃতীয় বিকল্পের ছবি মোটেই স্পষ্ট নয়। কিন্তু নিছক ভোটের সমঝোতা নয়, আন্দোলনের মধ্যদিয়ে একমাত্র সেই তৃতীয় বিকল্প বাস্তবরূপ পেতে পারে।' (গণশক্তি, ২রা জুন,২০০৪)

সুতরাং সমিতির সদস্যবন্ধুদেরও সেভাবেই চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। বর্তমানে এটাই সময়ের দাবী।

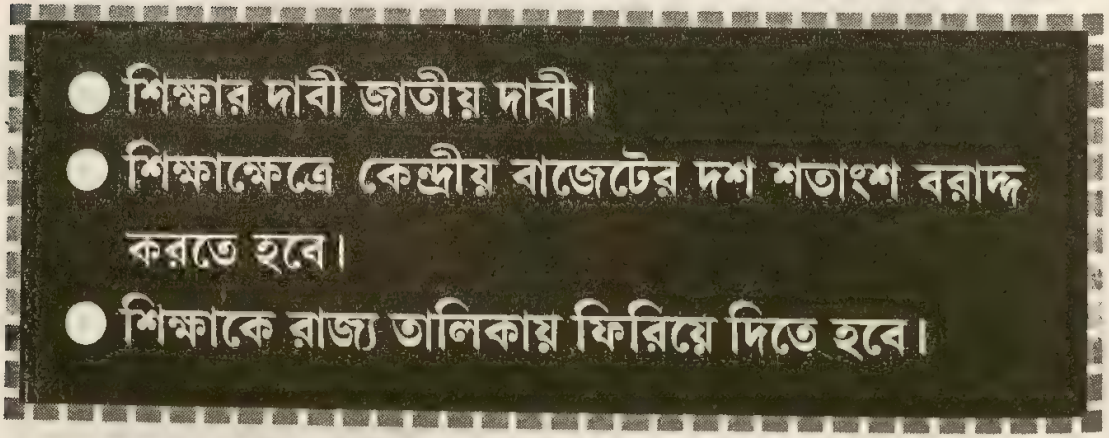

কেন্দ্রে ইউ পি এ সরকারের কাছে দাবী ঃ

গৈরিক দূষণ থেকে মুক্ত হোক শিক্ষার অঙ্গন

অসিতকুমার ভৌমিক

সহ-প্রধান শিক্ষক, উষুমপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, উত্তর ২৪ পরগণা

একুশ শতক শুরুর প্রাক্-লগ্ন থেকেই দুনিয়াজুড়ে যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির নতুন নতুন ক্ষেত্র বিকশিত হচ্ছে, আমাদের দেশও যখন ওই অগ্রগতির ধারায় তথ্য-প্রযুক্তির বিকাশক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করতে উন্মুখ, তখনই তার সামনে পর্বতপ্রমাণ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে দেশের বি জে পি-নেতৃত্বাধীন এন ডি এ-সরকার। উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আর এস এস)-চালিত ওই সরকারের ছ'বছরের (১৯৯৮-২০০৪) শাসনকালে সবচাইতে বেশি কলঙ্কিত হয়েছে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ও সংস্কৃতি। রাজনীতির সাথে সাম্প্রদায়িকতার মেলবন্ধনে সৃষ্ট গৈরিক হানাদারদের হাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরীহ মানুষেরা যেমন আক্রান্ত হয়েছেন, তেমনি আক্রান্ত হয়েছে দেশের শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্র। এমনকি, গবেষণামূলক কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও এই আক্রমণ থেকে রেহাই পায় নি। এই অবস্থায় সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে দেশের সচেতন মানুষ তাঁদের সুচিন্তিত রায়ে ক্ষমতাশীল সাম্প্রদায়িক শক্তিকে কেবল ক্ষমতাচ্যুতই করেন নি, একই সাথে তাঁরা বামপন্থী এবং ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির উপরও প্রবল আস্থা জ্ঞাপন করেছেন। এরই ফলশ্রুতিতে দেশে বর্তমানে ক্ষমতাসীন হয়েছে কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা (ইউ পি এ) সরকার এবং বামপন্থী শক্তি সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে এই সরকারের সমর্থক হিসেবে পাশে রয়েছে। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই দেশের ছাত্র-শিক্ষকসহ লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী সমাজ আন্তরিকভাবেই চাইছেন দেশের শিক্ষার পবিত্র অঙ্গন থেকে উগ্র হিন্দুত্ববাদী আর এস এস-পরিচালিত বি জে পি-জোট সরকারের আমলে পুঞ্জীভূত সাম্প্রদায়িকতার আবর্জনারাশি ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। শিক্ষার অঙ্গন হোক্ গৈরিকদূষণ থেকে মুক্ত। শিক্ষা হোক একান্তভাবে বিজ্ঞানধর্মী, উদার মানবতাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ।

মানুষের স্বাভাবিক ধারণা, আর এস এস মৌলবাদী সংগঠন এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ওরা সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ত। কিন্তু আর এস এস-এর কাছে তাদের এই পরিচয়ই যথেষ্ট নয়। ওরা বোঝে, সাম্প্রদায়িক আগ্রাসনের পথকে নিষ্কণ্টক করতে, ওদের ভাবাদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রকে সুমসৃণ করতে নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার হল শিক্ষা। সাম্প্রদায়িকতার অনুকূলে এই হাতিয়ার যত বেশি শাণিত হবে, দেশের পরিকাঠামো-উপরিকাঠামো তত বেশি নিয়ন্ত্রণে আসবে। এই উপলব্ধি থেকেই আর এস এস তাদের অন্যতম প্রধান গৈরিক চাঁই বিজ্ঞানের অধ্যাপক (!) ডঃ মুরলী মনোহর যোশীকে এন ডি এ-সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন তথা শিক্ষামন্ত্রকের দায়িত্ব দিয়েছিল। এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে সঙ্ঘনিষ্ঠ যোশী কালবিলম্ব না করে পরম নিষ্ঠাভরে শিক্ষাকে গৈরিক রঙে রঙীন করতে নতুন নতুন সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করেন। এর কিছু সময় পরে আর এস এস-এর প্রধান হিসেবে উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার চূড়ামণি কে আর সুদর্শনের অভিষেক যোশীর কাজকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করে। এই দু'জনের কৌশলে সরকার এবং সঙ্ঘ মিলে-মিশে এক হওয়ার পরিণামে শিক্ষাক্ষেত্রে নেমে আসে ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক আগ্রাসন।

শিক্ষাক্ষেত্রে এই আগ্রাসনের কাজটি যাতে সহজতর হয়, তার জন্য স্বয়ংসেবক যোশী শিক্ষামন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়ে ১৯৯৮-এর ২২শে অক্টোবর দিল্লীতে শিক্ষামন্ত্রীদের এক সভা আহ্বান করেছিলেন। উক্ত সভায় সঙ্ঘপ্রেমী কাঠ ব্যবসায়ী (শিক্ষাবিদ্ ?) পি ডি চিৎলাঙ্গিয়ার মাধ্যমে যোশী যে 'শিক্ষাদর্শন' পেশ করেছিলেন, তার যে ক'টি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তা হল — এক, প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সর্বস্তরে বেদ ও উপনিষদকে অবশ্যপাঠ্য করতে হবে। দুই, সংস্কৃতকে তৃতীয় শ্রেণী থেকে পড়াতে হবে এবং উচ্চশিক্ষায় ও গবেষণামূলক কাজে ব্যবহৃত বই ও তথ্যপঞ্জীসমূহকে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করতে হবে। তিন, বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকি গবেষণা কেন্দ্রগুলিতেও আধ্যাত্মিক শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক। চার, বৃত্তিমূলক শিক্ষায়

বেদ-উপনিষদের সাথে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ভারতীয় দর্শন (হিন্দু দর্শন) পড়াতে হবে। পাঁচ, সংস্কৃতচর্চাকে ব্যাপক ও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য দেশে ৪টি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হবে.....ইত্যাদি। এইসব নির্দেশ ও পরিকল্পনা থেকে সহজেই অনুমেয়, বি জে পি-র এই শিক্ষাদর্শন বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী চিন্তাধারাকে পুরো খতম করে দেশটাকে মধ্যযুগীয় অন্ধকারে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে কতখানি ভয়ঙ্কর! আসলে, শিক্ষার মধ্যে এইসব বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি সঙ্ঘ পরিবারের প্রচলিত শিক্ষাক্রম থেকেই গৃহীত। ১৯৫৯ সালে আর এস এস সরাসরি শিক্ষাপ্রচারের আইনী সুযোগ লাভের সময় থেকে আজ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে ওদের স্কুল-কলেজের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে বিদ্যার্থী সংখ্যা (২০ লাখেরও বেশি) এবং শিক্ষকসংখ্যা (প্রায় ৮৫ হাজার)। এইভাবে সঙ্ঘ পরিবার বিদ্যালয় ও কলেজ স্তরে সমান্তরাল পাঠক্রম চালু রেখেছে। ওদের নিজস্ব পাঠক্রমে রয়েছে ৬টি বিষয় ঃ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা, শারীর শিক্ষা, সংস্কৃত, সঙ্গীত, যোগ এবং সংস্কৃতিজ্ঞান। এছাড়া বৈদিক ক্যালকুলাস, বৈদিক অর্থনীতি বিষয়েও ওরা গবেষণা চালু করেছে। আর এস এস-এর এই শিক্ষাক্রমকে বি জে পি-শাসিত রাজ্যগুলির স্কুল-কলেজের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে শিক্ষায় গৈরিকীকরণের কাজটি সুপরিকল্পিতভাবে করা হচ্ছিল। এই অবস্থায় কেন্দ্রে ১৯৯৮-এ বি জে পি-জোট ক্ষমতাসীন হওয়ায় ওই বিজ্ঞানবিরোধী অনৈতিকহাসিক শিক্ষাকে আরও ব্যাপকতা দেওয়ার লক্ষ্যে তৎপরতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এইভাবে শিক্ষামন্ত্রকের মুরলীমনোহর এবং আর এস এস-এর সুদর্শন — উভয়ের যৌথ উদ্যোগে শুরু হয়েছিল 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ'-এর কর্মসূচি। এই কর্মসূচির মূল কথা ছিল শিক্ষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, প্রশাসন — সবকিছুরই সাম্প্রদায়িকীকরণ। এই কারণে যোশী ইতিহাসের বিকৃতিসাধনকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তাঁর অভিমত ছিল, 'এমনভাবে ইতিহাস সাজাতে হবে যাতে আমাদের হাজার হাজার বছরের হিন্দু ভাবাবেগ রক্ষিত হয় এবং নতুন প্রজন্ম ভাবতে পারে তারা সেই সুমহান পরম্পরার সন্তান'। যোশীর এই বক্তব্যের সূত্র ধরে আর এস এস-এর ইংরেজি মুখপত্র 'অর্গানাইজার' তাদের ২০০০-এর জানুয়ারী সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লিখেছিল, 'গত কয়েক বছর ধরে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস লেখার নামে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীরা এমন শক্তিগুলিকে সামনে তুলে ধরছে যাদের মতাদর্শগত আনুগত্য ছিল অভারতীয় শক্তি এবং দর্শনের প্রতি। ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রটিকে এই শক্তি কব্জা করার চেষ্টা করছে। এদের হাত থেকে ইতিহাসকে মুক্ত করতেই হবে'। বলাবাহুল্য, যোশীর 'হাজার হাজার বছরের হিন্দু ভাবাবেগ রক্ষা করা' এবং 'অর্গানাইজার'-এর 'ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীদের হাত থেকে ইতিহাসকে মুক্ত করা'র সুমহান (!) কর্তব্য সম্পাদনের লক্ষ্যে 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ্ হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ' থেকে খ্যাতনামা ঐতিহাসিকদের বহিষ্কার করে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তৃত্বের দায়িত্ব সঙ্ঘ পরিবারের 'সুশিক্ষিত' ক্রীতদাস জি আর গ্রোভারকে দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, সমগ্র জাতির মগজ ধোলাই-এর জন্য সর্বাগ্রে ইতিহাসকে বিকৃত করে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসার জন্য ঠিক এমন কাজটাই করেছিল মুসোলিনী-হিটলার। হিটলার যেমন জার্মান জাতিকে সবার উপরে ঠাঁই দিতে ইতিহাসের উপর বলাৎকার করেছিল, এদেশের সঙ্ঘ পরিবারের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি যোশীও তেমনি গ্রোভারকে দিয়ে দেশের ইতিহাসকে খুন করে হিন্দুত্বকে ভারতীয়ত্ব বলে চালাতে সচেষ্ট থেকেছে। এই খুনের প্রক্রিয়া কেবল ইতিহাস-এ নয়, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সংঘটিত করেছে। এছাড়া, ওরা ছাত্রদের মগজ-দূষণ করার নানাবিধ প্রক্রিয়ায় দেশজুড়ে চালিয়েছে মেধা-হনন ও পরম্পরা-হননের দানবিক তৎপরতা। সঙ্ঘ পরিবারের বৈশিষ্ট্য হল, ওরা অস্ত্রকে ভয় পায় না, হিটলারের মত ওরা ভয় পায় যুক্তিবাদী বুদ্ধিজীবীদের স্বাধীন মেধাকে, যে মেধা কারোর কাছে নতি স্বীকার করে না। এই কারণেই ওরা তাদের সাফল্যের পথকে নিষ্কণ্টক করতে দেশের প্রথম সারির শিক্ষা ও গবেষণামূলক প্রায় সব প্রতিষ্ঠান থেকেই ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিমনস্ক বুদ্ধিজীবীদের অপসারিত করে সঙ্ঘের আদর্শে নিবেদিতপ্রাণ কট্টর হিন্দুত্বপ্রেমীদের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে। এই রকমই একজন হলেন হরি গৌতম, যিনি ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস্ কমিশনের শীর্ষপদে আসীন হয়ে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে জ্যোতিষশাস্ত্র ও পুরোহিততন্ত্র চালু করার ফতোয়া জারি করতে এতটুকুও লজ্জাবোধ করেন নি। একইভাবে ভয়ঙ্কর দুই মুসলিম-বিদ্বেষী কে জি রাস্তোগী এবং জে এস রাজপুত এন সি ই আর টি-এর যথাক্রমে অধিকর্তা ও সহ-অধিকর্তার পদে আসীন হয়ে সমগ্র পাঠ্যসূচীকে উগ্র হিন্দুত্বের মোড়ক দিতে সামান্যমাত্র দ্বিধান্বিত হন নি! এইরকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে যা 'শিক্ষা ও সাহিত্য'-এর পাঠকমাত্রই অবহিত আছেন। আমাদের সমিতির এই প্রিয় মুখপত্রটিতে বিভিন্ন সময়ে গুণী লেখকদের, বিশেষ করে

প্রাবন্ধিক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকীকরণের ভয়াবহ বীভৎসাকে নিয়ে বেশ কিছু লেখা প্রকাশিত হওয়ায় আমরা কেন্দ্রের বি জে পি-জোট সরকারের শিক্ষার সর্বনাশা বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। তাই এ সম্পর্কে সবিস্তারে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে যে বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখের প্রয়োজন, তা হল — মন্ত্রিত্বের তক্‌মা আঁটা অথচ হিন্দুত্বের তিলক কাটা মুরলী মনোহর কিন্তু শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকীকরণের বিরুদ্ধে যখনই প্রশ্ন উঠেছে, তখনই তিনি তা খণ্ডন করতে অবলীলাক্রমে রাধাকৃষ্ণান কমিশন, মুদালিয়ার কমিশন, কোঠারি কমিশনের সুপারিশকে অপব্যাখ্যায় উপস্থাপিত করেছেন। অথচ শিক্ষার ইতিহাসে এই তিন কমিশনের সুপারিশের মূল কথা ছিল — শিক্ষাকে হতে হবে উদার মানবতাবাদী এবং শিক্ষায় দৃষ্টিভঙ্গী হবে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত। রাধাকৃষ্ণান কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ছিল — 'কেবল হিন্দুধর্ম বা হিন্দু আধ্যাত্মিক নেতাদের জীবনীই নয়, বুদ্ধ-কনফুসিয়াস-জরাথুষ্ট্র-সক্রেটিশ-যীশু-মহম্মদ-কবীর-নানক — এঁদের সকলের কথাই পড়তে হবে এবং ধর্ম সম্পর্কে উদার মানবতাবাদী দৃষ্টি আয়ত্ত করতে হবে। এই দৃষ্টিই বহুত্ববাদী সমাজের বহুত্ববাদী সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে।' মুদালিয়ার কমিশনের বক্তব্য ছিল — 'শিক্ষায় মৌলিক ও বুনিয়াদী কাঠামোই হবে উদার জাতীয়তাবাদী-ধর্মনিরপেক্ষ-মানবতাবাদী। না হলে তা দেশ ও জাতির কোনো কাজে লাগবে না।' কোঠারি কমিশনের সুপারিশে বলা হয়েছিল, 'জাতি গঠনের প্রশ্নে শিক্ষাকে অনড় ধ্রুপদী ধাঁচা ছেড়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে।' বলাবাহুল্য, সংঘ পরিবার এবং তার আজ্ঞাবহ বি জে পি-জোট সরকারের শিক্ষানীতি উক্ত তিন কমিশনের সাথে আদৌ সম্পর্কযুক্ত নয়। বেদ, উপনিষদ, পুরোহিততন্ত্র, জ্যোতিষবিদ্যা, সংস্কৃতশিক্ষা, সরস্বতী বন্দনা ইত্যাদি কোনটাই ঐসব কমিশনের বক্তব্যের সাথে মেলে না। অথচ দেশের মানুষকে ভাঁওতা দেওয়ার জন্য যোশী-আদবানিদের মুখে বারে বারে ঐ তিন কমিশনের কথা ঘুরে ফিরে এসেছে। আসলে, সঙ্ঘ পরিবারের পশ্চাৎমুখী শিক্ষাভাবনায় চালিত বি জে পি-জোট সরকারের সঙ্ঘপ্রেমী শিক্ষামন্ত্রী মুরলী মনোহর যোশী গত ছ'বছরে শিক্ষার অঙ্গন ও শিক্ষাচিন্তাকে যেভাবে গৈরিকদূষণে দূষিত করেছেন, তাতে একমাত্র হিটলারি শিক্ষানীতির কথাই মনে এনে দেয়। যোশীর শিক্ষাদর্শনের ভয়ঙ্কর মুসলিম-বিদ্বেষ মনে করিয়ে দেয় হিটলার-প্রবর্তিত 'অর্ডার ক্যাসেল্‌স' নামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কথা। ঐসব প্রতিষ্ঠানেও শিক্ষার্থীদের মনে ইহুদী-বিদ্বেষকে বীভৎসভাবে জাগিয়ে তোলা হত। বলা হত, জার্মান জাতির দেহেই কেবল শুদ্ধ রক্ত প্রবহমান ; সুতরাং ইহুদী-নিধনের মাধ্যমেই দেশে এবং বিশ্বে জার্মান জাতিকে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে। বলাবাহুল্য, বৌদ্ধিক এবং চৈতন্যগত এই ফ্যাসিবাদই চাপিয়ে দিতে সচেষ্ট ছিল আমাদের দেশের পূর্বতন বি জে পি-জোট সরকার।

মনে রাখতে হবে, নির্বাচনে পরাজয় ঘটলেও সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী শক্তি কিন্তু দেশের মাটি থেকে নির্মূল হয়ে যায় নি। ওরা পরাজয়ের গ্লানিতে সাময়িকভাবে উদ্যত ফণা নামালেও ওদের ফোঁসফাঁস কিন্তু শোনা যাচ্ছে। যে কোন সময়ে আবার ফণা তুলে ছোবল মেরে বিষ উগ্‌রে দিতে ফন্দি-ফিকির করতে পারে। তাই ওদের বিষদাঁত ভেঙে দিতে দেশের মানুষের চেতনাকে সর্বাগ্রে সজাগ ও সতর্ক করা প্রয়োজন। এর জন্যই শিক্ষার সিলেবাসকে দ্রুত গৈরিকীকরণ-মুক্ত করতে হবে। বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় — সর্বস্তরে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাকে সুনিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির শীর্ষে অবস্থানকারী সঙ্ঘনিষ্ঠ গৈরিক পাপাচারী কাপালিকদের দূর করে দিয়ে যথার্থ জ্ঞানী-গুণী শিক্ষাবিদ্‌দের সমর্যাদায় আসীন করার আশু ব্যবস্থা নিতে হবে। এলাহাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের সচেতন মানুষ দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সঙ্ঘ পরিবারের পক্ষে সকল অপকর্মের মূল ঠিকাদার মুরলী মনোহর যোশীকে তাঁর 'নিশ্চিত আসন'-এ শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে তাঁকে সমুচিত শাস্তি দিলেও তাঁর মাত্রাতিরিক্ত অপরাধের আরও কঠোর শাস্তি প্রাপ্য হয়ে আছে। এই কারণে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের সকল বেনিয়মের, অবৈধ কর্মকাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ তদন্তের যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে কেন্দ্রের ধর্মনিরপেক্ষ ইউ পি এ সরকারকেই। ভুলে গেলে চলবে না, বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে, গুজরাট হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে, কয়েক শ' সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে সঙ্ঘ পরিবার ও তাদের রাজনৈতিক মুখোশ বি জে পি এবং তার জোটসঙ্গীরা যে অপরাধ করেছে, ভয়ঙ্করত্বের বিচারে, শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে, স্বাধীন যুক্তিবাদী চিন্তাধারার স্রোতকে অবরুদ্ধ করে ওরা যে ফ্যাসিবাদী বর্বরতার প্রকাশ ঘটিয়েছে, তা কোন অংশে কম অপরাধমূলক নয়। সুতরাং দেশের শিক্ষার অঙ্গনকে গৈরিকদূষণ থেকে মুক্ত করার সাথে সাথে উক্ত ফ্যাসিস্ত অপরাধীদেরও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

ছুটি নিয়ে দু'চার কথা

দীপালী সেনশর্মা, হাওড়া

'ছুটি'র অর্থ কি? আক্ষরিক অর্থে আমরা ছুটি বলতে বুঝি কর্ম থেকে মুক্তি। ছুটির প্রয়োজনীয়তা বাস্তব জীবনে অনস্বীকার্য। ক্লান্তি দূর করার মাধ্যম একটু অবসরগ্রহণ, মুক্তজীবনের মধ্যে একটু স্বচ্ছন্দ বিচরণ। অতএব ছুটি আমাদের অবশ্যই প্রয়োজন।

আমাদের বাংলা মাধ্যম শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থাৎ বিদ্যামন্দিরে শিক্ষক-শিক্ষিকারা যে দায়িত্ব পালনে ব্রতী হয়েছেন, সেখানে একটা সমস্যার অঙ্কুর সম্প্রতি অনেকের মনেই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। বিতর্কিত সমস্যাটি 'ছুটি'কে কেন্দ্র করেই সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

শিক্ষার পরিকাঠামো সম্পর্কে দু'চার কথা লিখেই মূল সমস্যাটির আলোচনা প্রসঙ্গে চলে যাব।

বিদ্যামন্দিরে যে অপাপবিদ্ধ ছাত্র-ছাত্রীরা আসে, তাঁদের উন্নতিকল্পে শিক্ষাব্রতীরা তাঁদের আন্তরিক অবদান উজাড় করে দিয়ে তৃপ্ত হন। আজ যে শিশুকোরক প্রস্ফুটিত হতে চলেছে, ভবিষ্যতে সেইতো পদ্মের পাপড়ি মেলে সম্পূর্ণ চরিতার্থতায় দেশের সুনাগরিক হবে। অতএব শিক্ষাদানে যাঁরা ব্রতী তাঁদের দায়িত্ব তো সর্বাগ্রে প্রাধান্য পায়।

দুঃখের বিষয়, অশিক্ষা আর নিরক্ষরতার অন্ধকারে আমরা আজও অনেকটাই আচ্ছন্ন হয়ে আছি। একথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অশিক্ষা মানে অন্ধকার — মৃত্যু, আর শিক্ষা মানে আলো — জীবন। তাই সুকুমারমতি যে বিদ্যার্থী-মুকুলেরা পাঠ গ্রহণ করতে আসে, তাঁদের গড়ে তোলার জন্যই শিক্ষাব্রতী কারিগরেরা সমাজে একটা বিশেষ স্থান অলংকৃত করে রয়েছেন।

Eduaction is the manifestation of perfection already in man.

– Vivekananda

শিক্ষার আলোকে আলোকিত জনগণ জাতির গৌরব। মানুষের সচেতন পরিপূর্ণতা না এলে তাকে ঠিক মনুষ্য পদবাচ্য বলা যেতে পারে না। তাই শিক্ষাই যাতে আমাদের বলদৃপ্ত এক হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায় সে প্রচেষ্টা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে।

ভারতবর্ষে সাক্ষরতার আন্দোলন চলা সত্ত্বেও পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে যে, ৬৫-৩৮% মানুষ সাক্ষর। এতো আমাদের সার্বিক কলঙ্ক। সমাজে যে বিশেষ ধরনের এক অসাম্য দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে, তার মূল কারণও তো শিক্ষার অভাব। অশিক্ষা দারিদ্র্যের অপর প্রধান কারণ।

শিক্ষার উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করতে গেলে শিক্ষার প্রধান চারটি লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। প্রথমত, শিক্ষার দ্বারা জানতে শেখা; দ্বিতীয়ত, শিক্ষার মাধ্যমে কিছু করতে শেখা; তৃতীয়ত, সকলকে মিলিতভাবে বাঁচতে শেখা এবং চতুর্থত, সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে বিকশিত হয়ে ওঠা। এই চারটি লক্ষ্যবস্তু যদি সিদ্ধ হয় তবে স্বভাবতই মানুষের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটবে এক সফল চরিতার্থতায়।

এবার আমাদের বিদ্যালয়গুলির দিকে একটু যদি তাকাই তবে অনেকক্ষেত্রেই বিদ্যালয়গুলির অভ্যন্তরীণ চিত্র দেখে মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনেকক্ষেত্রেই কমে আসছে। কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মনের মধ্যে হোঁচট খেতে হয়।

ভাল স্কুল বলতে অভিভাবক-অভিভাবিকারা এই ধারণাই পোষণ করেন সেখানে ছুটি কম, শিখন দিবসের সংখ্যা বেশি। এদিক থেকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলি তো নিশ্চিতভাবে ছাত্রসংখ্যার দিক দিয়ে আমাদের বাংলা-মাধ্যম স্কুলগুলিকে হার মানিয়ে চলেছে।

অভিভাবকদের স্পষ্ট অভিমত যে, শিক্ষাদান দিবস যে বিদ্যালয়ে যত বেশি, সে বিদ্যালয় তত ভাল। বাংলা-মাধ্যম বিদ্যালয়গুলির ছুটির আধিক্য অভিভাবকদের বিরূপ সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

এছাড়া আরও ত্রুটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিদগ্ধ শিক্ষকমণ্ডলী বিদ্যালয়গুলিতে পড়ানোর চেয়ে 'প্রাইভেট টিউশনি'র দিকে একটু বেশি মাত্রায় মনোযোগী হয়ে উঠেছেন। কোচিং ক্লাশে পড়ার সামর্থ্য অনেক ছেলেমেয়ের হয়তো নেই। তারা

স্কুলের শিক্ষকদের ওপর ভরসা করেই পড়াশোনা করতে চায়। বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের ওপর নির্ভর করে থাকলে এইসব ছেলেমেয়েরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এক অংশের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠছে কার্যকরী শিখন দিবস বাড়ানোর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, তারই ওপর ভিত্তি করে। পর্ষদের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে কার্যকরী শিখন দিবস ১৫ দিন বাড়বে। এতে স্বভাবতই শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মিগণ যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। কিন্তু যদি এবিষয়ে একটু চিন্তা করে দেখা যায়, তবে একথা মানতেই হবে যে এতদিন যেসব ছুটি প্রবর্তিত ছিল তাতে সরকার কোনও বাধার সৃষ্টি করেন নি।

বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন, ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়ন, সিলেবাস শেষ করা প্রভৃতি দায়িত্ব অবশ্যই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। সেক্ষেত্রে একটি শিক্ষাবর্ষে কমবেশি ২০০ দিন কার্যকরী শিখন দিবস তো অবশ্যই প্রয়োজন। কার্যকরী শিখন দিবস ২০০ দিন করার জন্য পর্ষদ একটি ছক তৈরি করেছেন। ৩০·৪·২০০৪ তারিখে পর্ষদ একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। সেই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বলা হয়েছে যে, আগামী শিক্ষাবর্ষে, রবিবার বাদ দিয়ে, সারা বছরে ৮০ দিনের বদলে মোট বিদ্যালয়-ছুটি (School Holidays) ৬৫ দিন করা হবে।

শিক্ষায়তনের সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য শিখন দিবস বাড়ানো অবশ্যই প্রয়োজনীয়, এতে বিদগ্ধ শিক্ষকমণ্ডলীর অসন্তোষ থাকা তো উচিত নয়। যেসব ছুটি এতদিন প্রচলিত ছিল, প্রয়োজনের দিকটি বিবেচনা করে সরকার সেসব ছুটি তো প্রত্যাহার করেন নি। বিভিন্ন ধরনের যেসব ছুটি শিক্ষক-শিক্ষিকারা পেয়ে এসেছেন সেগুলি হলো — (ক) ১৪ দিন সি এল, (খ) ৬০ দিন অর্ধবেতন ছুটি অথবা ১ মাস 'কমিউটেড লিভ' (বেতন সহ), (গ) মেটারনিটি লিভ, (ঘ) ১৮ মাস রোগভোগের ছুটি, (ঙ) ৫ বছর বিনা বেতনে ছুটি। সম্প্রতি 'মেটারনিটি লিভ' আরও ১৫ দিন বাড়িয়ে ১৩৫ দিন হয়েছে। এই ছুটিগুলির কোনওটাই নাকচ করা হয়নি। অতএব এ নিয়ে শিক্ষকমহলে বিক্ষোভের ঝড় ওঠা ঠিক নয়।

ব্যক্তি-মালিকানার বিদ্যালয়গুলিতে ২২০ দিনেরও বেশি শিখন দিবস। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অভিভাবকেরা ঐসব বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের পড়াতে আগ্রহী হন।

বাংলা-মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিতে সিলেবাস অনুযায়ী যদি পঠন-পাঠন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে করতে হয় তবে তার জন্য সময় তথা বেশিদিনের প্রয়োজন। বাণীর মন্দিরে বেনেদের অবাধ প্রবেশ ঘটছে। শিক্ষা কি পণ্য হিসেবে গণ্য হবে? কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকা বিদ্যালয়ের বাইরে প্রাইভেট টিউশনি করে অর্থোপার্জন করছেন, তাতে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। তাঁদের প্রাইভেট টিউটর রাখার সামর্থ্য নেই। এইসব ছেলেমেয়েরা কিভাবে পরীক্ষায় ভাল ফল আশা করবে বিদ্যালয় যদি তাঁদের সাহায্য না করে?

আন্তরিকতার জারক রসে সিক্ত করে ছাত্রছাত্রী তথা বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন করতে গেলে শিক্ষাব্রতী ছাত্রদরদী শিক্ষককুলকে সরকার-নির্ধারিত শিখন দিবসকে অবশ্যই স্বাগত জানানো উচিত। আমরা আশা করব, মনের মধ্যে অসন্তোষের গ্লানি জমিয়ে না রেখে বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতির জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কর্তব্য বিদ্যার্থীদের কল্যাণ কামনায় দরদী হাত বাড়িয়ে দেওয়া। তবেই শিক্ষাদানের সার্বিক উন্নতি, বিদ্যালয়গুলির মানবৃদ্ধি, ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণ — সমস্ত কিছু আমাদের স্বপ্ন না থেকে বাস্তবে রূপায়িত হবে।

আসুন, আমরা আন্তরিকতা দিয়ে শ্রেণীশিখন দিবস বাড়িয়ে, গুরুত্ব সহকারে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করে অসম প্রতিযোগিতার আক্রমণের মুখে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে লোকপ্রিয় করে তুলি। অন্যথায় আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।

'শিক্ষা ও সাহিত্য' পত্রিকার গ্রাহক বৃদ্ধির জন্য
সংগঠিত উদ্যোগ গ্রহণ করুন।

চাঁচাছোলা ভাষায় বলে দিয়ে অনেকের কাছেই অপ্রিয় হয়েছে। এই বড়দাই হয়ত এখন একটা পথের ঠিকানা বলে দেবে যে পথে প্রতিটি মানুষই মানুষের মর্যাদায় বাঁচতে পারে।

—তাহলে এ অবস্থায় আমরা কি করব বড়দা?

—কি আবার করবি? মনের জোরে যা ন্যায্য যা সঠিক সেটাই করবি। আমি তো বুঝতেই পারছি মুর্শিদাবাদ জেলাটা পাকিস্তানের ভাগে পড়বে—এই ভয়ে অনেকেই কাঁপছে। কিন্তু ভারত ভাগ করে যারা স্বাধীনতা আনছে তাদের সম্পর্কে কিছুই বলছে না। যদি সত্যিসত্যিই এই জেলাটা ভারতেই থেকে যায়, তখন কিন্তু এরা আনন্দে আত্মহারা হবে, কিন্তু যে সব জেলা পাকিস্তানে গেল সেখানকার সংখ্যালঘুদের মনের অবস্থার কথা কিন্তু এদের একবারও মনে পড়বে না। মানুষ এতটাই স্বার্থপর বুঝলি?

এই কথাগুলো বলতে বলতে সুনির্মল যেন কোথায় একটা চলে গিয়েছিল। রাগ, অভিমান, যন্ত্রণায় তার প্রতিভাদীপ্ত মুখখানা যেন গনগনে আগুন। সে যেন কিছু বলার জন্যে সুযোগ খুঁজছিল। কিন্তু কাকে বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। সুনির্মল তখনো বলে চলেছে,

—তুই ভেবে দেখত পিন্টু, মুসলমান কেন, নিম্নবর্ণের মানুষদের আমরা এতদিন কি চোখে দেখেছি। এ জেলায় মুসলিমদের সংখ্যা যথেষ্ট। সে তো আমরা জানি। ইস্কুলে-কলেজে-খেলার মাঠে সর্বত্রই এদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়, তারা কিন্তু জানে আমাদের দুর্গাপূজা কেন হয়। সরস্বতী পূজা কেন হয়। এতো দূর থেকে তারা অংশগ্রহণও করে। কিন্তু আমরা কি মহরমের তাৎপর্য, সুবেবরাত কি, ঈদ-রোজা এইসব কি কারণে তার ন্যূনতম কারণ জানি কি? না, তা নিয়ে আমাদের মনে কোন কৌতূহল আছে? অথচ ওদের পাশাপাশি আমরা বড় হচ্ছি.....।

পিন্টুর মনের ভিতরটা সেই মুহূর্তে যেন উল্টেপাল্টে যাচ্ছে। বড়দা তার পরিণত চিন্তা দিয়ে যা বুঝতে পারছে পিন্টুর পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। সে ইতিমধ্যেই পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে তো বটেই, নিজেদের বাড়ীতেও রীতিমত একটা মানসিক চাঞ্চল্যের আঁচ পাচ্ছে। পিসীমারা তাদের দুই ভাই ধীরেন্দ্র এবং মানবেন্দ্রর কাছে তাঁদের মনের অবস্থার কথা খুলেই বলেছেন। ঠাকুর্দার আমলে কেনা বারাণসীর কেদারঘাট সংলগ্ন দুখানা বাড়ীতে কতজন বিধবা ভাড়াটিয়া আছে, সেখানে ক'খানা ঘর খালি আছে, এইসব নিয়েও খোঁজ-খবর চলছে। মা-কাকীমাও স্বস্তিতে নেই। লক্ষ্ণৌতে রাঙাদির ঠিকানায় চিঠিও চলে গেছে যদি ওখানে চার-পাঁচটা ঘরের বাড়ীভাড়া পাওয়া যায়।

কিসের তাহলে বল-ভরসা পিন্টু-রুণা যে এতদিন ইয়াসিন, খালেক, ইরফান, হাবিবকে নিয়ে গর্ব করত এখন শুধু দেশভাগের জোরে এক ফুঁয়ে সে সব উড়ে যাবে। আজই পিন্টু রুণাকে সঙ্গে করে মুসলমান পাড়ায় যাবে বলে ঠিক করল।

সে পাড়াটা খুব একটা দূরে নয়। পাদ্রী সাহেবের হাতাটা ডানপাশে রেখে বেশ কয়েকটা বাঁশঝাড়ের মধ্যে দিয়ে উঁচু একটা ডাঙার দিকে তাকাতেই দেখল তিন/চারজন যুবক তাদের দিকে দৌড়ে আসছে। চিনতে অসুবিধা হয় না। ইয়াসিনই দৌড়ে এসে পিন্টুর হাত চেপে ধরে। ও সব সময়েই পরিপাটি করে চুল আঁচড়ায়। বাড়ীতে সাবান ঘষে কাচা পাঞ্জাবী। পায়জামাও মোটের ওপর পরিষ্কারই থাকে। আজ যেন সম্পূর্ণ বিপরীত। চুল রুক্ষ, এলোমেলো। পোষাকটাও কতদিন যেন সাবানের মুখ দেখেনি। চোখের কোল ভাঙা, দৃষ্টি ভয়ার্ত। সে পিন্টুর হাত ধরে টেনে একটা আমগাছের পিছনে নিয়ে যাচ্ছে। এতে রুণাও যেন ভয় পেয়ে যায়,

—এই, এই তোরা কি করছিস?

—ভয় পেয়োনা রুণাদি, শিগগির তোমরা ফিরে যাও, ইরফান বলে। ততক্ষণে পিন্টুকে কিছুটা দূরে নিয়ে গিয়ে যা বলার বলে ফেলেছে ইয়াসিন।

ঘটনা হচ্ছে, মুর্শিদাবাদ জেলাটা নাকি পাকিস্তানে যাচ্ছে না, এই ধরনেরই একটা সংবাদ মুসলমান পাড়ায় এসেছে। ওখানে এখন 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'-এর প্রস্তুতি। পিন্টু আর রুণাকে ওরা কিছুতেই এই বিপদের মধ্যে যেতে দেবে না।

(ক্রমশ)

Pragmatism ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দর্শন

অধ্যাপক দিলীপ নারায়ণ ঘোষ রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এটা সহজেই বোঝা যায় যে এই ঢেউয়ের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত লড়াইয়ে সর্বপ্রথম আঘাত আসবে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির ওপর। প্রতীয়মান-অপ্রতীয়মানের মধ্যেকার কার্যকারণ সম্পর্কের ছোঁয়াচ যেন বিন্দুমাত্র না লাগে জনসাধারণের মনে সেটার প্রয়াস হবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখন একজন প্রকৃত ভাববাদীর কাছে এই বিষয়টা এতটা সমস্যাজনিত নয় যতটা গোলমেলে ঠেকে এটা এক অবক্ষয়ী ভাববাদী মানুষের কাছে। কেননা (যেমন বলা হয়েছে ওপরে) প্রকৃত ভাববাদী দর্শনের দিক থেকে এটার মোকাবিলার রাস্তা একটি খোলা আছে। সেটা হচ্ছে ঈশ্বর, mind the absolute idea-র মধ্যস্থতা। যেমন ধরুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ Amherst College-এর সভাপতি Calvinist Edward Hitchcock বা বিজ্ঞানে ভাববাদী মনোভাবের Paul Chadbourne-এর কথা। Hitchcock আমাদের শোনালেন যে 'অনুবীক্ষণ যন্ত্র হচ্ছে Jehovah-র জ্ঞানের অগ্রগতির ষষ্ঠ ধাপ' এবং ভূতত্ত্ব বিশ্বসৃষ্টির স্বর্গীয় পরিকল্পনা ও পরিচালনা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অনেক প্রসারিত করছে।[৫] আর Chadbourne-এর মতানুসারে 'সৃষ্টির পরিকল্পনার' ঐশ্বরিক বিভূতিই ডারউইনের evolution-এর তত্ত্বের মাধ্যমে 'Reason of man' হিসেবে প্রতিফলিত হচ্ছে।[৬]

বলা বহুল্য যে সাম্রাজ্যবাদীদের দার্শনিক যারা হবেন তাদের কাছে এই ধরনের কথাবার্তা ক্ষমার্থ হতে পারে না, কেননা ঈশ্বরের দোহাই দেওয়া সত্ত্বেও বস্তুজগতের অস্তিত্বকে প্রকৃতভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। অথচ বিজ্ঞান প্রসারতা লাভ করছে এবং ঘাঁটি গেড়েও বসছে।

"A real science of man is being built up ..... [which] has already a vast material extent....." — James নিজেই বলছেন।[৭]

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি চার্লস্ ইলিয়টকে বোঝালেন James যে বিজ্ঞানের (পদার্থিক এবং দার্শনিক) এই "vast material extent"-এর বিরুদ্ধে লড়াই চালানো পুরোহিত দার্শনিকদের কাজ নয়। এরজন্য চাই এমন একজন যিনি নিজে বিজ্ঞানী (James পেশায় Physiologist অর্থাৎ শরীর বিজ্ঞানী), কাজেই বিজ্ঞানের কথাবার্তা বলতে পারেন এবং দর্শনের লড়ালড়িতে কোথায় ঘাটতি আছে সে সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল (James শরীরবিদ্যার থেকে সরে এসে মনস্তত্ত্বে এবং দর্শনে মনোনিবেশ করেন)। উনিই হবেন সেই ব্যক্তি যিনি বিজ্ঞানের কথাবার্তা দিয়েই এমন এক মোচড় খাওয়াতে পারেন বিজ্ঞানকে যা দিয়ে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সরিয়ে এনে মনকে 'more introspective kind'-এ টেনে আনা যায়। একটু পরেই আমরা দেখবো যে 'more introspective kind' বলতে James যা বলতে ইচ্ছুক তা হচ্ছে নির্ভেজাল Solipsism. সোজা ভাষায় বৈজ্ঞানিক, বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে ধর্মান্ধতায় পরিণত করা। এই কাজটি করবার ক্ষমতার দাবিতেই শরীরবিদ্যার বিজ্ঞানী William James হার্ভার্ডে দর্শনের অধ্যাপকের পদ লাভ করেন।[৮] লেনিন যে James-এর শ্রেণির 'চিন্তাবিদ্'দের 'Scientific Salesmen of Theology' বলে অভিহিত করছে তার পিছনে কারণ যথেষ্টই রয়েছে। ফরাসি ঔপন্যাসিক অ্যানাটোল ফ্রান্সের কাছেও pragmatism কারসাজিটা পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে।

'যুক্তিবাদী মনে (in the minds of rationalists) ধর্মীয় চিন্তার প্রাধান্য প্রসারের জন্য সম্প্রতিকালে আবিষ্কার করা হয়েছে pragmatism-এর' — বলছেন অ্যানাটোল ফ্রান্স।[৯] কেবল এখানেই দাঁড়ি টানছেন না William James. উনি pragmatism-এর দর্শনটা এমনভাবে তৈরী করবেন যার সাহায্যে 'হিংসায় কাতর গরীব মানুষের অভ্যুত্থানের হাত থেকে ধনপতিদের সন্তান-সন্ততিদের রক্ষা করা যেতে পারে।'[১০]

Pragmatism : Solipsism + Cash Value

এবার আসা যাক pragmatism-এর সারমর্মের আলোচনায়। এক কথায় pragmatism-এর দর্শন হচ্ছে

solipsism. বস্তু (দার্শনিকভাবে) এবং চিন্তানিরপেক্ষ অস্তিত্বকে অস্বীকার করাই এর তত্ত্বের প্রাথমিক কর্তব্য। আদিগুরু Chauncy Wright বলছেন ঃ[১১]

'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ positivism-এর তত্ত্ব (বলছে) জ্ঞানের আপেক্ষিকতার কথা — বস্তু বলতে আমরা যা জানি তা আমাদের mental states ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তুর বৈশিষ্ট্য বলে যেগুলি আমরা বস্তুতে অর্পণ করি সেগুলি mental stateগুলিরই অর্পণ। এর বেশি আর জানার ক্ষমতা আমাদের নেই।' আরো পরিষ্কারভাবে উদাহরণ দিয়ে বলছেন Wright :[১২]

'অন্যান্য যে কোনো তত্ত্বের মতোই আকাশবিদ্যাও প্রকৃত বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ঘটনাবলি (phenomena) এবং তাদের নিয়মের যথার্থ বিবরণ একমাত্র যদি এই ঘটনাবলি mental states হয় তবেই' (পূর্ব উল্লেখিত)। Chauncy Wright বলতে চাইছেন যে বস্তুজগতের ঘটনাবলি, নিয়মাবলি ইত্যাদি সবই মেনে নেওয়া যায় তখনই যখন এ সমস্তকে কেবলমাত্র আমাদের mental states বলে স্বীকার করা হয়।[১৩]

পাঠক অবশ্যই ধরতে পারছেন যে William Jamesও এতে পেছপা হবার লোক নন। যাইহোক না কেন James হচ্ছেন এই দর্শনের প্রধান প্রবক্তা (John Dewey ব্যতিরেকে)।

"বাস্তবতার ধারণাটা সব কিছুর থেকে আমাদের emotion-এর সঙ্গেই জড়িত বেশি..... আমি 'আমার' জগতকে সৃষ্টি করি চেতনার স্রোতের মধ্যে" — বলছেন James.[১৩] চেতনার স্রোতের (stream of consciousness) বক্তব্য Jamesian মনস্তত্ত্বের মেরুদণ্ড।[১৪] Pragmatism-এর ধারা বেয়ে এসে James আরো প্রবর্তন করলেন 'radical empiricism'-এর।Radical এই empiricism-এর 'thesis'টা কি তা শোনা যাক thesis-এর প্রবক্তার মুখ থেকেই — from the horse's mouth যেমন বলা হয় মার্কিনী কথোপকথনের ভাষায়। 'আমার থেসিসটা হচ্ছে' — ব্যাখ্যা করছেন James [১৪] — এই যে যদি আমরা গোড়াতেই ধরে নিই যে একদম আদিবস্তু বলে কিছু একটা আছে (there is only one primal staff on material) যা দিয়ে সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে এবং এই আদিবস্তুকে যদি 'pure experience' বলে বলা হয় তাহলে জানার ব্যাপারটাকে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়.....। লক্ষ্য করুন কেমনভাবে কোনো রকম ভ্রুক্ষেপ না করেই James 'আদিবস্তু..... যা দিয়ে সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে' বলতেই pure experience-এর কথা বলছেন। এখন এই experienceটা স্বভাবতই 'আমার' কেননা mental statesটা 'আমার' এবং stream of consciousness থেকে 'আমি' বেছে নিই ইত্যাদি। অর্থাৎ pure experience হচ্ছে pure solipsism.এই দর্শনের প্রসিদ্ধতম প্রবক্তা John Dewey অপর আরেকজন অবক্ষয়ী ভাববাদী। তবে Dewey যে পেছল এক সরীসৃপ তা বলা হয়েছে মন্তব্য 'থ'তে। Chauncy Wright-এর মতন এমন সাদাসিধে মানুষ নন Dewey. তবে কথায় যেমন বলে — "রং যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না ম'লে।" অনেক ভণিতা করলেও solipsism-এর বেরিয়ে আসাটা এমন কি John Dewey-র মতো "ambiguous" বক্তব্যে অভিজ্ঞ, দক্ষ লোকও ঠেকাতে পারছেন না। Quixotic এক লড়াইয়ের ভণিতা করছেন Dewey ভাববাদীদের বিরুদ্ধে। ভাববাদকে ধমকাচ্ছেন John Dewey - "মন" বলে স্বতন্ত্র কোন কিছু নেই যার একমাত্র কাজই হলো "জানা"।[১৫] "জানার" ব্যাপারে কেবল "মনই" নয়, "হাত-পা" সবেরই প্রয়োজন হয়।[১৬] পরিবেশের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে (in interconnection with environment) কার্যকলাপই হচ্ছে চিন্তা এবং পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার চিন্তা হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। অতীব সত্য কথা, ভাববেন পাঠক। কিন্তু গোলমালটা হচ্ছে এইখানে যে Dewey'র কাছে environment জিনিসটা (যার সঙ্গে interconnection-এ এবং যেটার নিয়ন্ত্রণের কার্যকলাপ হচ্ছে thinking) হচ্ছে 'logical' environment, চিন্তানিরপেক্ষ বস্তুজগত নয়। শেষোক্তটির নাম দিয়েছেন Dewey 'an archetypical reality'.[১৭] জানার বস্তু আর জানার প্রক্রিয়া এর মধ্যে তফাৎ করা যায় না। জানাটা এই নয় যে আমরা দর্শক হয়ে গিয়ে বাস্তব বলে কোন কিছুকে দেখছি। দর্শক আর বাস্তবের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। অর্থাৎ বাস্তবটা চিন্তানিরপেক্ষ না হয়ে জানার ওপরেই নির্ভর করছে। যেমন, ফুটবল খেলাটা দর্শকদের চিৎকার-চেঁচামেচির দ্বারা প্রভাবিত হয়।[১৮] জানা জানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এক জানার উৎপত্তি ও শেষ আরেক জানার মধ্যেই — 'all logical forms... arise within the operations or inquiry and are concerned with control of inquiry....'[১৯] এইসব ভণিতার পর, thinking, operations of inquiry, thinking instrumental in controling environment ইত্যাদি নানা কথাবার্তার পর John Dewey বলে ফেললেন ঃ

"জ্ঞানের আসল বস্তু (the true object of knowledge) হিসেবে রয়েছে নির্দিষ্ট কার্যকলাপের ফলাফল..... অনুসন্ধানের সিদ্ধান্তগুলি an archetypical antecedent reality'কে প্রতিফলিত করবে এটা কোনো কথা নয়..... জানা বস্তুর অস্তিত্ব কেবল নির্দিষ্টভাবে অনুষ্ঠিত কার্যকলাপের ফলাফলের মধ্যেই। আগের থেকেই বর্তমান (antecedent) কোনো কিছুর সাথে খাপ খাওয়ানোতে নয়"[১৯] এবং "true and valid objects of knowledge [are] prior to and independent of operations of knowing"[২০] এই ধারণা ভ্রান্ত। সোজা ভাষায় চিন্তানিরপেক্ষ বস্তুজগতের যথার্থ প্রতিফলন জ্ঞানের উদ্দেশ্য হতে পারে না, কেননা 'আমি' (a spectator), 'আমার' directed actions (যেটাকে আমরা বলেছি 'নির্দিষ্টভাবে অনুষ্ঠিত কার্যকলাপ)-এর ফলাফল ছাড়া কোনো antecedent, archetypical reality বলে কোনো কিছু নেই। এক inquiry হচ্ছে অন্য আরেক 'inquiry'র 'product'. এই অন্য আরেক inquiry হচ্ছে অন্য আরেক 'inquiry'র 'product'— এই চলতে থাকবে সীমাহীনভাবে।

Dewey শুরু করলেন এমনভাবে যেন ভাববাদীদের বিরুদ্ধে সাংঘাতিক একটা লড়াই করবেন উনি (অবশ্যই Quixotic)। তারপর knowledge এবং thinking'কে একাত্ম করলেন operations of inquiry'র সঙ্গে যেটা Copenhagen School-এর Quantum তত্ত্বের থেকে ধার করা বুলি। তারপর এক inquiryকে অন্য আরেক inquiry'র product করলেন এবং এটা James-এর pure experience বা Chauncy Wright-এর mental states-এর নিম্নস্তরের বিশ্লেষণ। এসবের পর সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে চিন্তানিরপেক্ষ বস্তুজগত (matter) বলে কিছু নেই এবং ফলে জ্ঞানের মাপকাঠি হবে 'matter'-এর প্রতিফলন এবং ভ্রান্তিকর। অর্থাৎ সোজাসুজি অবক্ষয়ী ভাববাদ যেটা এত ভণিতা না করে Wright or James-এর মতো বলা যেত। আমরা আরও একটি মন্তব্য করব John Dewey সম্পর্কে। এই 'শিক্ষাব্রতীর' দার্শনিক বুলিগুলি যে নিম্নস্তরের শুধু তাইই নয়। অজস্র সিদ্ধান্ত, উপমা ইত্যাদি যেগুলি উনি লিপিবদ্ধ করেছেন সেইগুলি প্রায়শই ধোপে টেকে না এবং সহজেই খণ্ডণীয়। একমাত্র Maurice Cornforth-এর 'Science versus Idealism' পড়লেই পাঠক এটা অনুধাবন করতে পারবেন।

আমাদের অব্যবহিত পরবর্তী আলোচনার প্রসঙ্গে অপর আরেক আদিগুরু Charles Saundus Peirce-এর একটা বক্তব্য উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। Peirce বলছেন,[২১]

"Consider what effects, which might conceivably have practical bearings, we conceive the object of our conception to have. Then, our conception of these effects is the whole of our conception of the objects".

আবার সেই অবক্ষয়ী ভাববাদ। বস্তু বলে কিছু নেই। বস্তুর পুরোটাই হচ্ছে কি কি effect এটা তৈরী করবে, অবশ্যই আমাদের মনে। যাই হোক, pragmatism যে মূলগতভাবে অবক্ষয়ী ভাববাদী solipsism তার ওপর Peirce, Wright, James, Dewey-দের লেখা থেকে পর্বতপ্রমাণ উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে।

John Dewey'র কারসাজির আরো একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। একথা বললে বোধহয় খুব একটা ভুল হবে না যে পাতিবুর্জোয়া চিন্তাধারার মানুষ, প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবী, ধর্মপ্রচারক প্রমুখদের কাছে বিজ্ঞান ও ধর্মের মহাসম্মিলনটা অতীব প্রিয়বস্তু। বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠায় এদের অদম্য উচ্ছ্বাস। সাঁইবাবার কথামৃত আর বিজ্ঞানচর্চা উভয়ই যে সেই বিচারে একই লক্ষ্যের দিকে ধাবিত এই মহাচিন্তার প্রসারে এরা বিশেষ উদ্যোগী হন। পাঠক আগেই শুনেছেন মার্কিন সাঁইবাবা Edward Hitchcock এবং Paul Chadbourne-এর কথামৃত ঃ অনুবীক্ষণ যন্ত্র হচ্ছে Jehovah-এর জ্ঞানের ষষ্ঠ ধাপ আর সৃষ্টির ঐশ্বরিক পরিকল্পনা ডারউইনের evolution তত্ত্বের মাধ্যমে reason of man হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

এ সমস্ত বুজরুকি কুসংস্কার — metaphysics of idealism — একদমই সহ্য হচ্ছে না John Dewey'র। এসব হচ্ছে মুনাফালোভী, স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর মানুষজনদের কারসাজি — এমন ধরনের প্রতিবাদী কথাবার্তাও খানিক খানিক আওড়ালেন Dewey.[২২] ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয় গোছের ধাপ্পাবাজির বিরুদ্ধে 'তীব্র লড়াই' চালানোর কথা বললেন উনি আমাদের। বিজ্ঞান বলছে যে সবকিছু গতিশীল। অথচ আমাদের ধ্যান ধারণা, ধর্ম, নীতিবোধ (Dewey'র ভাষায় ideas of values) সবকিছু স্থিতিশীল হয়ে রয়েছে। আমাদের অনুমানগুলি সব হচ্ছে ideals of fixity —আমাদের শেখাচ্ছেন Dewey.[২৩] গতিশীল জগতে (বিজ্ঞান বলছে জগৎ গতিশীল) স্থিতিশীল

চিন্তাভাবনাকে (ideals of fixity) যে আঁকড়ে ধরে থাকি আমরা তার কারণ হচ্ছি — বলছেন Dewey — যে বিশেষ বিশেষ authorit[ies]-এর উপর ভিত্তি করে যে সমস্ত 'doctrine এবং dogma তৈরী হয়েছে সে গুলিতে আশ্বাস রাখি।[২৪] কাজেই মান্ধাতার আমল থেকে চলে আসছে যে সমস্ত dogma যেগুলি authoritarian, based on specific authorit[ies], সেইসব গুলিকে ভেঙে দিতে হবে। আমাদের adherence to anybody of doctrines-এর অভ্যাসটা দূর করতে হবে। ভীষণ বিপ্লবী আলোচনা।

পাঠক হয়তো বলবেন, এসবতো ভালো কথা, বস্তুবাদী কথা। বৈজ্ঞানিক কথা। এতে তো অবক্ষয়ী ভাববাদ কিছুতেই হচ্ছে না। Dewey'কে হঠাৎ চেনা মুশকিল কেননা শুরুতে উনি বিপ্লবী হবার ভূমিকা করেন। এই কথাবার্তা বস্তুবাদী হতেই পারে না কেন না বস্তুবাদকে Dewey নিজেই আখ্যা দিচ্ছেন "অবান্তর দর্শন" (irrelevant philosophy) বলে।[২৫] প্রকৃতপক্ষে, স্থিতিশীল ধ্যানধারণা, 'specific authority' র ওপর ভিত্তি করে doctrines এবং dogmas ইত্যাদি যে সমস্তগুলি ভেঙে তছনছ করে দিতে হবে সেগুলি হচ্ছে antecedent being, an archetypical antecedent reality ইত্যাদি সেগুলির কথা পাঠক মুহূর্ত খানিক আগেই শুনেছেন। মোদ্দাকথায়, বস্তুজগতের অস্তিত্ব আমাদের চিন্তানিরপেক্ষ এবং আমাদের চিন্তাবিশ্লেষণে। এই চিন্তানিরপেক্ষ বস্তুজগতের প্রতিফলনের যথার্থতায় মাত্রাই যে আমাদের (ব্যক্তিগত এবং সামাজিক — the sovereign human thought — যেমন বলছেন Engels [২৬]) জ্ঞানের মাত্রা — এটাকেই Dewey বলছেন specific authority'র ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত dogma, স্থিতিশীল ধ্যানধারণা এবং এরই বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই (militant struggle) চালানোর হুমকী দেন John Dewey. বস্তুজগতের চিন্তানিরপেক্ষ অস্তিত্বের মূল বস্তুবাদী বক্তব্যটাকে Dewey চালিয়ে দিচ্ছেন বেমালুম metaphysics of idealism বলে। অর্থাৎ তিলকে তাল করছেন। কালোকে সাদা, সাদাকে কালো করছেন। দিনকে রাত এবং রাতকে দিন করছেন।

"বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি যে চূড়ান্ত কোন বাস্তবের (ultimate real, existence at large) অন্তর্নিহিত ধর্মগুলিরই আবিষ্কার এসব হচ্ছে বস্তাপচা, মান্ধাতার আমলের metaphysics..... জ্ঞানের অর্থই যে কোনো এক fixed and antecedent reality'কে উন্মোচন করা এই ধারণা বর্জন করুন ; চিন্তা করতে শিখুন যে জানার উদ্দেশ্য এবং যথার্থতা কেবল অনুসন্ধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ (in the actual procedures of inquiry....)[২৭]

প্রকৃত জ্ঞান থাকে (আমাদের) directed action-এর ফলাফলের মধ্যে.... অনুসন্ধানের সিদ্ধান্তগুলির যে মডেলের সঙ্গে মিল হবে, সেই মডেল চিন্তানিরপেক্ষ বস্তুজগৎ নয়..... বস্তুর অস্তিত্ব directed operations-এর ফল, আগের থেকেই বর্তমান কোনো কিছুর সঙ্গে চিন্তা পর্যবেক্ষণের conformity-র জন্য নয়.....[২৮]

নানান রকমের শব্দ ব্যবহার করছেন Dewey হরেক জায়গায়। যেমন, directed operations, procedures of inquiry এবং অবশ্যই experience. লেনিন অত্যন্ত জোরালভাবে ধরেছেন Dewey'দের গোছের 'দার্শনিকদের' ধান্ধাটা। লেনিন বলছেন যে হরেকরকমের প্রতিক্রিয়াশীল, অবক্ষয়ী ভাববাদীরা আপাতদৃষ্টিতে নির্দোষী 'experience' কথাটার মধ্যদিয়ে যতকিছু কারসাজি সেগুলি করার চেষ্টা করেন। Experience টা অবশ্যই 'আমার' experience. Directed operations বা procedures of inquiry অবশ্যই হচ্ছে 'আমার' directed operations এবং procedures of my inquiry. জ্ঞানের যথার্থতার ভিত্তি হিসেবে objective reality[৭] কে অপসারণ করা মাত্রই 'আমি' ('আমরা' শব্দটা বসালেও কথাটা একই থাকে) এবং 'আমার' ছাড়া অন্য কোনো সত্তার উপস্থিতি হাস্যস্পদ। মোদ্দাকথায়, এসবই হলো কার্ল পিয়ারসনের সাদামাটা স্বীকৃতি — 'সবকিছুই গতিশীল। কেবল আমার মস্তিষ্কে' — solipsism-এর মূল এই বক্তব্যটাকে চাপাচুপি দিয়ে প্রকাশ করার দার্শনিক বাগাড়ম্বর। জ্ঞান হচ্ছে objective realty সম্বন্ধে জ্ঞান, এই বাস্তবতার প্রতিফলন, বিজ্ঞান চিন্তানিরপেক্ষ বস্তুজগতের অন্তর্নিহিত গূঢ়রহস্যগুলির সম্যক জ্ঞান ইত্যাদিকে এইসব বাগাড়ম্বরের সহায়তায় অস্বীকার করছেন John Dewey. বিপ্লবী কথাবার্তার ভান করে, প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে 'তীব্র লড়াই'-এর ভণিতা করে Dewey সেই solipsism'কেই প্রতিষ্ঠা করলেন। এ সম্পর্কে সন্দেহ যদি একটু আধটু থেকেও থাকে তার নিচের উদ্ধৃতিটি তা দূর করবে।

'(কেবল) বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাই বস্তুর অন্তর্নিহিত বাস্তবতার জ্ঞান লাভ করা যায়। যেটা অন্য আর কোন চিন্তাধারায় সম্ভব হয় না। এই (ধারণাটা) লোকে যেভাবে নিজেদের ওপর চাপিয়ে দেওয়াতে রাজী হয়েছে (the way men have let themselves be imposed upon) তা হাস্যস্পদ এবং আশংকাজনকও বটে। এটা অতীব হাস্যকর, কেননা

বিজ্ঞানের conception গুলি, অন্যান্য যন্ত্রপাতির মতোই, মানুষই তৈরী করেছে বিশেষ একটা স্বার্থের পরিপূরণের উদ্দেশ্যে (handmade by man in the pursuit of a certain interest)..... এর আশংকাজনক দিকটা হলো এই যে এটার থেকে বোঝা যাচ্ছে যে অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে চিন্তাগুলি সেগুলিকে দূর করা কি শক্ত ব্যাপার।"[২৯]

এই ধরনের কথাবার্তা হাজারে হাজারে উদ্ধৃত করা যেতে পারে John Dewey'র লেখা থেকে। ফেরা যাক যেখানে আমরা শুরু করেছিলাম — বিজ্ঞান এবং ধর্মের মহা সমন্বয়ের বিষয়ে। পাঠকের নিশ্চয়ই মনে আছে যে বিজ্ঞান এবং ধর্মের সমন্বয়ের মতো কুসংস্কার — metaphysics of idealism, idealism of fixity ইত্যাদিকে Dewey কেমন হেয় করলেন। Dewey বলছেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা রাজী হচ্ছি আমাদের ওপর এই ধারণা চাপানতে যে বিজ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে চিন্তানিরপেক্ষ বস্তুজগতের রহস্য উদ্‌ঘাটন করা, morality এবং ধর্ম যতক্ষণ পর্যন্ত চিন্তানিরপেক্ষ বস্তুজগতের সঙ্গে সম্পর্কের অলীকতা থেকে মুক্ত হতে না পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্ম এবং বিজ্ঞানের মধ্যে কষাকষি, রেষারেষি থাকতে বাধ্য এবং ফলে এ দুয়ের সমন্বয়ের metaphysics of idealismও চলতে থাকবে। আমাদের নিষ্ক্রিয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতায় (passive experience — যদি বার্কলের কথা ব্যবহার করা হয়) অগোচরে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবজন্তু, অণু-পরমাণু জগতের জ্ঞানটা বিজ্ঞানীদের অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে হবে, না ঈশ্বরবাদীদের Jehovah'র তত্ত্ব দিয়ে হবে এই লাঠালাঠির এবং উভয়কে একই শীলমোহরের দুটি দিক বলে প্রমাণ করার idealist প্রচেষ্টারও পরিসমাপ্তি ঘটার মূলে আছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুজগতের চিন্তানিরপেক্ষ অস্তিত্বের dogma, ideal of fixity, metaphysics ইত্যাদি। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই dogma'কে উৎখাত করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বরবাদীরা বিজ্ঞানের ভয়ে তটস্থ হবেন। কিন্তু এই dogmaটিকে অসীম সাহসবলে একবার যদি নির্মূল করা যায়, তার বিজ্ঞান এবং ধর্মের (science and religion) মধ্যে দ্বন্দ্বও নির্মূল হয়ে যাবে।

"(ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে) সমন্বয় ঘটানোর প্রশ্নটা যে উঠেছে এবং থেকেও যাচ্ছে একটাই মাত্র দারুণ (যেটা হচ্ছে) এই ধারণা যে জ্ঞানের অর্থ হলো চিন্তানিরপেক্ষ বস্তুজগতের বাস্তবতাকে প্রকাশ করা এবং জ্ঞান জিনিসটা হচ্ছে experienced objects-এর quality কে নিয়ন্ত্রণ করাতেও নিরপেক্ষ....."[৩০]

"বিজ্ঞান মানুষকে এতটা বিপদে ফেলতে পারতো না (would not have been troubled by the findings of science) যদি না morality এবং ধর্মকে চিন্তানিরপেক্ষ বস্তুজগতের প্রকাশের পরিবর্তে practical activity-র সঙ্গে জড়িত করা হতো।"[৩১]

এ ধরনের উদ্ধৃতি গণ্ডায় গণ্ডায় দেওয়া যেতে পারে John Dewey-র লেখা থেকে। আমরা দেখলাম যে metaphysics of idealism-এর বিরুদ্ধে 'তীব্র লড়াই'য়ের মূল উদ্দেশ্য হলো বিপ্লবের ভণিতা করে solipsism'কে প্রতিষ্ঠা করা, বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিরোধিতা করা এবং পেছনের দরজা দিয়ে ধর্মকে ঢোকান। Chauncy Wright বা William James-এর প্রকট Berkeleyan Solipsism'কে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করতে Dewey-র বেশ অসুবিধে হচ্ছে।[৩২]

মন্তব্যের পাতা

৫. Philip R. Wiener : Evolution and the Founders of Modern Pragmatism, ১৯৪৯। Harry K.Wells-এর Pragmatism: Philosophy of Imperialism-এ উদ্ধৃত।

৬. উপরে উল্লিখিত।

৭. William James, Pragmatism.

৩. James-এর নিজের কথাতেই pragmatism হচ্ছে এমন একটি দর্শন যেটার চরিত্র 'religious like the rationalism, but at the same time, like the empiricists, it can preserve the richest intimacy with facts' (Pragmatism). এটা বলার পরেই বলছেন James, ধর্মভীরু এবং ঈশ্বরের ভয়ে কাতর আমেরিকানদের কাছে তার দর্শনকে জনপ্রিয় করে তোলার আশায় — 'ঈশ্বরের দোহাইটা কাজে লাগে, তবে pragmatistic নীতি অনুসারে (ঈশ্বর) সত্য..... আপনাদের আমি বলছি যে (অলৌকিক) ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ওপর (religious experiences) আমি একটা বই লিখেছি যেটাতে মোটামুটিভাবে ঈশ্বরের বাস্তবতার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং আপনারা আমার নিজস্ব pragmatism এবং moralistic ধর্মীয় দর্শন আপনাদের আমি দিলাম এর চাইতে উৎকৃষ্টতর ধর্মীয় সমন্বয় (religious synthesis) আপনারা অন্য কোথাও পাবেন না' (Pragmatism)। সাধারণত নাস্তিকতা প্রায় জঘন্য একটি ব্যাপার মার্কিন মানসে। William James এটা ভাল করেই জানেন। সুতরাং তার দর্শন নাস্তিকতার অভিযোগে অভিযুক্ত হবে এমন অভিলাষের

বিন্দুমাত্র অভিলাষী নন James. অন্য আরেক জায়গায়, seance, trance ইত্যাদি গাঁজাখুরি, অলৌকিক ব্যাপারগুলি সম্বন্ধে বলছেন James,

"সত্যি কথা বলতে কি যে trance গুলির কথা আমি বলছি সেগুলি আমার মনে প্রকৃতির শৃঙ্খলার সীমারেখা নষ্ট করে দিয়েছে। যে বিজ্ঞান এইসব ধরনের অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করে সেই বিজ্ঞান আমার কাছে পথের ধূলোয় পড়ে আছে; বর্তমানে আমার কাছে সব থেকে জরুরী বিষয় (intellectual need) হচ্ছে বিজ্ঞানকে আবার সেইভাবে গড়ে তোলা যে বিজ্ঞানে এসব জিনিসের ইতিবাচক স্থান (positive place) থাকবে"

— William James : The Will To Believe.

৮. Harry K. Wells, পূর্বে উল্লিখিত।

৯. Anatole France : The Revolt of the Angels, Cornforth-এর Science versus Idealism-এ উদ্ধৃত।

১০. William James : Principles of Psychology, vol. II. কিছু পরেই Psychology'র ওপর James-এর principles-এর উদাহরণ দেখান হবে।

১১. James B. Thayer : Letters of Chauncy Wright, ১৮৭৮। Frank Abbat বলে এক শিষ্যের কাছে লেখা।

১২. উপরে উল্লিখিত।

থ) এখানে Chauncy Wright অনেকটা কার্ল পিয়ার্সনের মতো আচরণ করছেন। ইংরেজ অবক্ষয়ী ভাববাদী পিয়ার্সন স্বীকার করেন যে 'সবকিছুই গতিশীল। কিন্তু শুধুমাত্র আমার মস্তিষ্ক।' লেনিন প্রশংসা করেন পিয়ার্সনের কথাটা খোলাখুলিভাবে বলার জন্য (Materialism and Empirio-Criticism). সেইরকম Chauncy Wright'ও একবারেই খোলাখুলিভাবে বলছেন যে উনি একজন solipsist. বিপরীতে সর্বপ্রসিদ্ধ 'শিক্ষাব্রতী' John Dewey'র সম্বন্ধে এটা একেবারেই বলা যায় না। John Dewey'র আচরণ empirio-movist Bogdanov এবং Lunacharskyদের মতো। Dewey হচ্ছেন পেছল সরীসৃপ। রুশ empirio-criticist এবং empirio-movist-দের মতো John Dewey'ও কথাটা কখনোই পরিষ্কারভাবে বলেন না — কোনো কথাই নয়। হরেক রকমের ভণিতা করা, অসাধুভাবে বক্তব্য অপরিষ্কার রাখা, নানান ধরনের কথার জাল এবং শব্দের বুনুনির সৃষ্টি করে নিজস্ব মতামতকে ধামাচাপা দেবার প্রচেষ্টা Dewey'র বিশেষত্ব।

'(Dewey'কে) পরিষ্কারভাবে নিজেকে প্রকাশ করার কথা বলে কোনো ফল পাওয়া যায় নি। তার কোনো বক্তব্যই পরিষ্কার এবং একার্থবোধক নয় এবং মনে হয় যে জ্ঞানের এই (pragmatic) তত্ত্বকে যেন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই অপরিচ্ছন্ন এবং দ্ব্যর্থবোধক রাখা হয়েছে' — বলছেন Cornforth (Science versus Idealism).

এসব কারণেই এবং বিশেষ করে 'শিক্ষাব্রতী' হিসাবে খ্যাত হওয়ার জন্য John Dewey'র ওপর আলাদাভাবে বক্তব্য রাখা হবে এই প্রবন্ধে।

১৩. William James : Principles of Psychology.

দ) James-এর 'stream of consciousness' হচ্ছে বোধহয় সবথেকে প্রতিক্রিয়াশীল অংশ pragmatic মার্কিন মনস্তত্ত্বের। এই বক্তব্য অনুযায়ী sensation-এর বিশৃংখল স্রোত 'আমাকে' অবিচ্ছিন্নভাবে আঘাত করে যাচ্ছে। Sensation-এর এই বিশৃংখলা (primordial chaos of sensations) থেকে 'আমি' 'আমার' মতো করে sensations কিছু কিছু বেছে নিই এবং 'আমার' বাস্তবতা সৃষ্টি করি। বলাই বাহুল্য যে এই ধরনের 'বাস্তবতার' যে কোনো রকম শয়তানী-বদমায়েসী কার্যকলাপের (শোষণ, হত্যা, যাই হোক না কেন) পেছনে ন্যায্যতার যোগান দেওয়া যায়। কেন না যেহেতু বাস্তবতা কেবল 'stream of consciousness'য়েই সীমাবদ্ধ এবং এর পিছনে চিন্তানিরপেক্ষ বাস্তবতার অস্তিত্ব কিছু নেই। সুতরাং কার বলার সাহস রয়েছে যে কোন্ বাস্তবতা খারাপ এবং কোন্‌টা ভাল। একটু বাদেই আমরা দেখব যে বাস্তবতায় সত্যতার pragmatic মাপকাঠি হচ্ছে success, cash-value ইত্যাদি। এই মাপকাঠির ব্যবহারে 'stream of consciousness' দিয়ে তৈরী বাস্তবতার ভিত্তিতে যে কোনো পাপ কাজ — শ্রমিক শোষণ, উদ্বৃত্ত মূল্য আহরণে নৃশংসতা, পরদেশ আক্রমণ, সাম্রাজ্যবাদ বিস্তার — এসব কিছুই ন্যায্য বিচারে বিবেচনার বহির্গত। দুর্ভাগ্যজনক যে কিছু কিছু বিজ্ঞানীরাও 'stream of consciousness'-এর খপ্পরে পড়ে গেছেন। প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের বিজ্ঞানীদের একটা চক্র বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিদ্, ডেনমার্কের Neils Bohr'কে কেন্দ্র করে The Copenhagen School নামে খ্যাত হয়ে আছে। অধ্যাপক Neils Bohr James -এর 'stream of consciousness'-এর বিশেষ অনুরাগী।

১৪. William James : Essays in Radical Empiricism.

১৫. John Dewey : Essays in Experimental Logic.

১৬. উপরে উল্লেখিত।

১৭. John Dewey : Quest for certainty.

ঠ) এই ধরনের কথাবার্তা Quantum তত্ত্বের Copenhagen School-এর ব্যাখ্যায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে। Neils Bohr, Max Born, Warner Heisenberg প্রমুখেরা নিয়মিত ব্যবহার করেছেন এই ধরনের ব্যাখ্যার। ফুটবল খেলার উদাহরণটা দিয়েছেন Max Born.

১৮. John Dewey : Essays in Experimental Logic.

১৯. John Dewey : Quest for certainty.

২০. উপরে উল্লেখিত।

২১. Charles Saundus Peirce : The Fixation of Belief, ১৮৭৮

২২. উপরে উল্লেখিত।

২৩. উপরে উল্লেখিত।

২৪. উপরে উল্লেখিত।

২৫. John Dewey : Quest for certainty.

২৬. Frederick Engels : Anti-Duhring

২৭. John Dewey : Quest for certainty.

২৮. উপরে উল্লেখিত।

ন) Objective reality, existence of reality, independent of user-এর পরিবর্তে নানান রঙের কথাবার্তা — an archetypical antecedent reality, antecedent being, existence at large ইত্যাদি কেবল যে imprecise তাইই নয়, বিভ্রান্তিকরও বটে। তবে অবশ্য, বিভ্রান্তি সৃষ্টি করাটা হচ্ছে pragmatist ভাববাদীদের একটা উদ্দেশ্য এতে কোনো সন্দেহ নেই।

২৯. John Dewey : Quest for certainty.

প) 'বিশেষ একটা স্বার্থ' বলতে Dewey বোঝাচ্ছেন objective reality রহস্য উন্মোচনের প্রচেষ্টা। আরও একটা Sleight of hand.

৩০. John Dewey : Quest for certainty.

৩১. উপরে উল্লেখিত।

ফ) অসুবিধে হওয়ার কারণও আছে। গরীব মানুষের অভ্যুত্থানের হাত থেকে ধনবানদের সন্তানদের রক্ষা করার জন্য যে যুগে কলম ধরতে হচ্ছে John Dewey'কে সে যুগটা William James-এর সময়ের থেকে কঠোরতর। Dewey'র সময় একেবারে সরাসরি রুশ বিপ্লবের সময়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঢেউয়ে ওলটপালট হচ্ছে দুনিয়া। দ্বান্দ্বিক এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অকল্পনীয় প্রভাব বিস্তার করছে। কাজেই এ সময়ে বিপ্লব বিপ্লব খেলার ছলটা বোঝা মোটেই অসুবিধে নয়।

संशोधन

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (২০০৪) কে বিষয় বুলেটিন মেঁ (১২ অপ্রৈল, ২০০৪) তথা 'শিক্ষা ও সাহিত্য' কে অপ্রৈল, ২০০৪ সংখ্যা মেঁ মুদ্রিত হৈঁ। আবৃত্তি বিষয় কে 'হিন্দী' কবিতা বিভাগ কে ('ক' তথা 'খ') কে লিএ মুদ্রিত দোনোঁ কবিতাওঁ মেঁ কুছ মুদ্রণ ত্রুটিয়াঁ হৈঁ। উন্হেঁ সংশোধিত কর দিয়া গয়া হৈ।

হিন্দী কবিতা 'ক' বিভাগ। (পংচম-অষ্টম শ্রেণী) 'মুক্তি কী আকাংক্ষা' কবিতা কী তীসরী পংক্তি মেঁ 'নিমর্ম' কে স্থান পর 'নির্ভয়' তথা বারহবীঁ পংক্তি মেঁ 'নিদর্বন্দব' কে স্থান পর 'নির্দ্বন্দ্ব' পঢ়না হৈ।

হিন্দী কবিতা 'খ' বিভাগ। (নবম-দ্বাদশ শ্রেণী) 'বহ দেশ কৌন-সা হৈ' কবিতা কী সপ্তম পংক্তি মেঁ 'নাটয' কে স্থান পর 'নাজ' পঢ়না হৈ।

('বহ দেশ কৌন-সা হৈ' কবিতা কা নির্বাচিত অংশ দিয়া গয়া হৈ)

ঊপর উল্লেখিত শিক্ষা ও সাহিত্য কে পৃষ্ঠ সংখ্যা ৫৫০ তথা বুলেটিন কে পৃষ্ঠ সংখ্যা ৬ কো দেখনে কে লিএ অনুরোধ কিয়া জাতা হৈ।

অনিচ্ছাকৃত ইস 'গলতী কে লিএ খেদ হৈ।

সম্পাদক
শিক্ষা ও সাহিত্য

ঠিকমত বাঁচব — মোটা হব না

ডাঃ কুন্তল বিশ্বাস

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বর্তমানে প্রায় বিগত ৩০ বছর ধরে বেশী বেশী মানুষের মধ্যে স্থূলত্ব দেখা দিচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মধ্য-বয়সীনি মহিলা, উচ্চ-বিত্তশালী ও শহুরে মানুষদের মধ্যে স্থূলত্বর প্রাবল্য। স্বল্প-বিত্তের মানুষদের মধ্যে বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে গ্রাম-শহরের তফাৎ ঘুচে যাচ্ছে। এর কারণ, জন্মের পর ঠিকমত পুষ্টি না পাওয়ার জন্য পরের বছরগুলিতে জন্ম থেকে ১২ বছর বয়সসীমায় ও বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে) দৈর্ঘ্যের খর্বতা হয়ে যাওয়ায় পরবর্তীকালে ওজন বাড়লে স্থূলত্ব আসছে অথচ পুষ্টিও সঠিকমাত্রায় থাকছে না। স্থূলত্বের ফলে ডায়াবেটিস, উচ্চ-রক্তচাপ ও রক্ত সংবাহনতন্ত্রের অসুখ হবার ঘটনা প্রচণ্ডহারে বাড়ছে। এতে শুধু ব্যক্তি ও পরিবারের ক্ষতিই হচ্ছে না, দেশের ক্ষতিও হচ্ছে।

একটি সমীক্ষায় প্রকাশিত যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৯৫ সালে স্থূলত্বের জন্য প্রত্যক্ষ খরচ স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের ৬.৮% (৭০ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার), শারীরিক কাজ কম করার জন্য খরচ ২৪ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার। এছাড়া অপ্রত্যক্ষ ব্যয় কত তা হিসাব করা যায় না। যথা — কর্মদিবস নষ্ট, চিকিৎসার জন্য ব্যয়, অক্ষমতার জন্য পেনসন এবং অকাল মৃত্যু

বিগত ৩০ বছরে খাবারের ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দৈনিক খাবারে বেশী স্নেহজাতীয় পদার্থ, বেশী শক্তি এবং জীবনধারার শারীরিক পরিশ্রম কমে যাওয়ার ফলে স্থূলত্ব বাড়ার সাথে সাথে ডায়াবেটিস-এর ঘটনাও বাড়ছে। এঁদের মধ্যে রক্তসংবাহনতন্ত্র ও শ্বাসতন্ত্রের কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ার লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। এর কারণগুলিও প্রতিরোধের উপায় আলোচনা করলে কতকগুলি বিষয় পরিষ্কার হয়। যথা—

নিয়মিত শারীরিক শ্রম বনাম কম শারীরিক শ্রম

নিয়মিত শারীরিক কাজ-এর ফলে অস্বাস্থ্যকর ওজন বাড়ার প্রবণতা কম থাকে। আগে কতটা শারীরিক কাজ করা হত তার ওপর এটি নির্ভর করে না। এখন বর্তমানে দৈনিক শারীরিক শ্রমই বিবেচ্য বিষয়। দৈনিক ৩০ মিনিট মাঝারি ধরনের ব্যায়াম, যথা, সমতলে হাঁটলে রক্ত সংবাহনতন্ত্রের অসুখ হবার বিপদ কমে। প্রথমদিনে ওজন বাড়া বন্ধ হওয়া বা কমার পর ব্যায়ামের সময় ৬০-৯০ মিনিট করলে ভাল হয়। এটিও একবারে না করে বারে বারে ভাগ করে করা ভাল। অন্যদিকে শরীর বিশ্রাম পায় এমন ধরনের জীবিকা ও অবসর বিনোদন, যথা, টি ভি দেখার ফলে মোটা হবার প্রবণতা বাড়ে।

দৈনিক খাবারে আঁশজাতীয় বস্তু বা ফাইবার থাকা

শর্করাবিহীন আঁশজাতীয় বস্তু ফাইবার দৈনিক ২৫-৫০ গ্রাম করে খেলে ওজন নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ৪মাস ধরে নিয়মিত ফাইবার খেলে ওজন অন্তত ২কেজি কমান যায়।

শক্তি বেশী থাকা খাবার যাতে খাদ্যপ্রাণ কম

এই ধরনের খাবারে মেদ বাড়ে অথচ পুষ্টি ঠিক হয় না। এই ধরনের খাবার বলতে বোঝায় চর্বি ও স্নেহজাতীয় পদার্থ বেশী থাকা খাবার ; যথা, মাখন, ঘি, চর্বি, বেশী সময় ধরে গরম করা তেল ব্যবহার করা হয় এমন খাবার, শর্করা জাতীয় খাবার, চিনি ইত্যাদি। এইসব খাবারে দেহে মেদ বাড়ে। অন্যদিকে সবুজ শাক-সবজি, হলুদ তরকারী, ফল ইত্যাদিতে সবজি কম থাকে, কিন্তু খনিজ, খাদ্যপ্রাণ ও জল বেশী থাকে। খাবারে ১০% স্নেহজাতীয় পদার্থ কম করলে মোটা ব্যক্তিদেরও ২মাসে ৩কেজি ওজন কমে। সবজি, ডাল ইত্যাদিতে তেল বেশী দিলে আবার মোটা হবার সম্ভাবনা।

পরিবেশ-এর প্রভাব

বাড়ি ও কর্মস্থলের পরিবেশ যদি উপযুক্ত হয় তা হলে খাবারের ধরন ঠিক থাকে। শৈশব থেকে যদি শিশুরা তাদের বাড়ীতে যদি ঠিকমতো স্বাদ ও বর্ণযুক্ত খাবার পায় ও বাড়ির বড়দের পরিশ্রম করতে দেখে, তাহলে তার প্রভাবে তারাও সেই ধরনের মানসিকতার অধিকারী হয়। তাই ছোট

বয়স থেকেই শিশুদের সব ধরনের ফল খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা ভাল। এজন্য অভিভাবকদের 'রোল-মডেল' হতে হবে।

ফাস্টফুড ও ড্রিংকসের প্রভাব

শিশুদের প্রভাবিত করার জন্য টি ভি ও অন্যান্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। শিশুদের প্রভাবিত করতে পারলে তাদের আব্দারে অভিভাবকেরা সেইসব পণ্য কেনেন। শিশুরা টি ভি দেখার সময় শারীরিক কাজ কম করে বলে তাদের মধ্যে স্থূলত্ব আসে। টি ভি দেখার সময় টুকটাক্ খাবার-খাওয়া তাদেরকে ফাস্টফুডের জন্যে প্রভাবিত করে। সেইসঙ্গে টি ভি-তে দেখানো 'ফাস্টফুড'-এর বিক্রি বাড়ে। ১৯৯৭ সালে আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রে বার্ষিক ১১ বিলিয়ন ডলারের ফাস্টফুডের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল।

নানা ধরনের ড্রিংকসে চর্বি ও তেল কম বা না থাকলেও চিনি বা মিষ্টি থাকে। কোল্ড ড্রিংকস-এ তরল দ্রুত পাকস্থলি থেকে খালি হয়ে যায় ফলে তাতে পেট ভরে না। প্রতি ৩৫০ মিলিলিটার কোল্ড ড্রিংকসে মোটা হবার সম্ভাবনা বাড়ে ৬০%

নিম্নবিত্ত পরিবারে মধ্যবয়সীনি মহিলা

এঁদের মধ্যে রক্তাল্পতা বেশী হবার কারণে শারীরিক অবসাদ বেশী হয়। ফলে কর্মোদ্যম কম হয়। ফলে অপুষ্টি থাকা সত্ত্বেও এঁদের মধ্যে স্থূলত্বের প্রাবল্য বেশী হয়।

শিশুদের স্তন্যপান করান

শিশু জন্ম থেকে ৬মাস বয়স অবধি শিশুকে শুধুমাত্র স্তন্যপান করালে শিশুর বৃদ্ধি স্বাভাবিক হয়। এইসময় শিশুকে বাইরের দুধ খাওয়ালে দেখা গেছে পরবর্তী বয়সে শিশুর রক্তের ডায়াস্টোলিক প্রেসার ও গড় আরটেরিয়াল প্রেসার বেশী হবার আশংকা থাকে। পরবর্তী জীবনে তাদের মোটা হবার প্রবণতাও বেশী দেখা যায়।

খাবার ধরন

যখন খাবারে মোট চর্বি ও স্যাচুরেটেড ফ্যাট, কোলেস্টেরল, নুন বেশী থাকে তখন মোটা হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। কিছুদিনের জন্য এই খাবার বন্ধ করে আবার এই ধরনের খাবার খেলে মোটা হবার সম্ভাবনা বাড়ে।

অল্প করে বারে বারে খেলে মোটা হবার সম্ভাবনা কম থাকে। শিশুদের ক্ষেত্রে তার চাহিদা অনুযায়ী খেতে দিলে মোটা হবার আশংকা কম থাকে। শিশুর খাওয়া ঠিক হচ্ছে কি না বোঝার জন্য শুধুমাত্র তার ওজন বাড়া দেখলেই হবে না তার দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধিও সঠিকভাবে হওয়া দরকার। শিশুর জন্মের সময় দৈর্ঘ্য এক বছর বয়সে দেড় গুণ হবে ও চার বছরে দ্বিগুণ হবে। শিশুর জন্ম ওজন ৫মাস বয়সে দ্বিগুণ হবে ও ১বছর বয়সে তিনগুণ হবে।

২বছর বয়সের আগে শিশুর টেলিভিশন না দেখাই ভাল। এরপর সপ্তাহে ৬ঘন্টা টেলিভিশন দেখা চলতে পারে। ৬মাস বয়স থেকে শিশুর খাওয়ার সময়, বড় কাউকে শিশুর সঙ্গে বসে ঐ একই খাবার খেতে হয় বা খাওয়ার ভান করতে হয়। ৩বছর বয়স থেকে শিশু বাড়ির সকলের সঙ্গে বসে একসঙ্গে খাবে।

বড়দের ক্ষেত্রে কতটা ওজন হওয়া উচিত— কিভাবে বোঝা যাবে?

আই সি এম আর-এর মতে ভারতে ২০ থেকে ৪০ বছর বয়সী একজন পুরুষের আদর্শ ওজন ৬০কেজি ও একজন মহিলার ওজন ৫০কেজি হওয়া উচিৎ। কিন্তু বাস্তবে পুরুষের গড় ওজন ৫২কেজি ও মহিলার ওজন ৪৪ কেজি। কিন্তু বংশ পরম্পরায় ধারাবাহিক শক্তি ও প্রোটিনের ঘাটতির ফলে উচ্চতার ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলার খর্বতা দেখা যায়। মহিলাদের উচ্চতা ১৪৫ সেন্টিমিটারের কম হলে তাদের সন্তান প্রসবের সময় সমস্যা হবার আশংকা থাকে। এরইসঙ্গে গর্ভাবস্থায় খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রাম ঠিকমত না হলে শিশুর জন্ম ওজন কম থাকার সম্ভাবনা থাকে। শিশুকে জন্ম থেকে ছ'মাস বয়স পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের না খাইয়ে অন্য কোন খাবার ও জল খাওয়ালে শিশুর বৃদ্ধি ঠিক হয় না। এই শিশুদের পরবর্তীকালে অপুষ্টি ও স্থূলত্ব দুইই থাকে। যৌবনের সময় থেকে উচ্চতার সঙ্গে দেহের ওজনের যে সম্পর্ক তা ঠিক থাকা প্রয়োজন। দেহের ওজন হওয়ার কথা উচ্চতার সেন্টিমিটারের মাপ থেকে ১০০ বিয়োগ করলে যত মান হয় তত কেজি। এর ১০% কম বা বেশী সীমার মধ্যে ওজন থাকা উচিত। অর্থাৎ একজন ১৬০ সেন্টিমিটার লম্বা ব্যক্তির ওজন হওয়া উচিত ১৬০—১০০ = ৬০ কেজি ও ১০% কম বা বেশী অর্থাৎ ৫৪ কেজি থেকে ৬৬ কেজির মধ্যে।

দেহের ওজন ও উচ্চতার সম্পর্কর হিসাবে 'বডি মাস ইনডেক্স বা বি এম আই দিয়ে বোঝা যায় তার পুষ্টির মান কি রকম।

বডি মাস ইনডেক্স বা বি এম আই=দেহের ওজন কেজিতে/(উচ্চতা মিটারে)^2 এই মান ১৮.৫-এর কম হলে—ওজন কম—সংক্রামক রোগের সম্ভাবনা বেশী।

১৮.৫-২৪.৯ ঠিক ওজন বিপদ কম

২৫-২৯.৯	বেশী ওজন	অসংক্রামক জীবনধারার অসুখ হবার আশকা—সামান্য
৩০-৩৪.৯	স্থূলত্ব—প্রথম বিভাগ	অসংক্রামক জীবনধারার অসুখ হবার আশংকা—মাঝারি
৩৫-৪৯.৯	স্থূলত্ব—দ্বিতীয় বিভাগ	অসংক্রামক জীবনধারার অসুখ হবার আশংকা—বেশী
৪০-এর বেশী	স্থূলত্ব—তৃতীয় বিভাগ	অসংক্রামক জীবনধারার অসুখ হবার আশংকা—খুব বেশী

ভারতীয়দের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যথা, দেহে চর্বির ভাগ বেশী। ফলে ভারতীয়দের ক্ষেত্রে বি এম আই ২১-২৩-এর মধ্যে থাকলে বিপদের আশংকা কম থাকে।

এরসঙ্গে দেখা উচিত কোমরের মাপ। পুরুষদের ক্ষেত্রে ১০২ সেন্টিমিটার বা তার বেশী ও মহিলাদের ক্ষেত্রে ৮৮ সেন্টিমিটার বা তার বেশী হলে বিপদের আশংকা বেশী।

মোটা হলে কি করা উচিত ?

● দৈনিক মাঝারি ধরনের শারীরিক পরিশ্রম করা, যথা, হাঁটা উচিত ১ ঘন্টা ধরে। এটি একবারে না করে বারে বারে করা ভাল। প্রতি ঘন্টায় (জেগে থাকার সময়ে) ৫ মিনিট করে হাঁটলে, সব চাইতে ভাল ফল পাওয়া যায়।

● দিনে অল্প করে বারে বারে (৫-৭বার) খাওয়া। এই খাবারের ১-২বার শুধু ফল বা সবজি খাওয়া এবং অন্য বারগুলির খাবারের অর্ধেক পরিমাণ সবজি ও ফল খাওয়া। যাদের শারীরিক শ্রম বেশী, তাদের খাবারে ভোজ্য তেলের পরিমাণ দৈনিক ৪০-৬০ গ্রাম অবধি রাখা দরকার।

● ডালজাতীয় শস্য গোটা অবস্থায় খাওয়া ভাল, যাতে খাবারে ফাইবার বা আঁশ থাকে। না হলে খাবারে দৈনিক ২০-৩০ গ্রাম ফাইবার থাকা দরকার। এরজন্য ইসবগুলের ভূষি ব্যবহার করা যায়।

● খাদ্যবস্তুগুলি রান্নার সময় তাতে যাতে খাদ্যগুণ সর্বোচ্চ মাত্রায় থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। রান্না করা ও খাদ্য সংরক্ষণ বৈজ্ঞানিকভাবে করা উচিত।

● বিশ্রাম-এর সময় সম্পূর্ণ শারীরিক ও মানসিক বিশ্রাম-দরকার। এসময়ে টি ভি দেখলে শারীরিক বিশ্রাম হয় বটে, মানসিক বিশ্রাম হয় না।

● নেশা সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত। মদ্যপান, মাদকদ্রব্য গ্রহণ, ধূমপান, তামাক ব্যবহার শরীরে-মনে সাময়িক ভাল লাগা তৈরী করলেও করতে পারে কিন্তু শরীর ও মনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

● মানসিক চিন্তা ও টেনশন শরীরে অবসাদ আনে। মানসিক উদ্বেগ কমান দরকার।

তথ্য ● বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিউট্রিশন ডায়েট, প্রিভেনশন অফ ক্রণিক ডিসিসেস।

● ওয়ার্ল্ড হেলথ রিপোর্ট-২০০২, রিডিউসিং রিসক, প্রোমোটিং হেলদি লাইফ।

● ওবেসিটি : প্রিভেনটিং এ্যাণ্ড ম্যানেজিং গ্লোবাল এপিডেমিক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট-২০০০।

● আই সি এম আর রিপোর্ট-২০০৩।

● অ্যাপ্রোচ পেপার অন নিউট্রিশন, যোজনা কমিশন, ভারত সরকার-২০০২।

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সদস্য হোন।

সদস্যপদ নবীকরণ করুন।

বার্ষিক সদস্য চাঁদা—২৫·০০ টাকা

শিক্ষা ও সাহিত্যের গ্রাহক চাঁদা

বিদ্যালয় প্রতি এবং ব্যক্তিগত— ৬০·০০ টাকা।

শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীদের স্বাস্থ্য পরিষেবা

লুৎফুল আলম
সহ-সাধারণ সম্পাদক, এ বি টি এ
সহ-সভাপতি, স্টুডেন্টস্ হেলথ হোম

স্টুডেন্টস্ হেলথ হোম সম্প্রতি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য সান্ধ্য স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু করেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকবন্ধুদের বহুদিন থেকেই একটা ভাবনা ছিল যে শিক্ষকগণ ছাত্রদের জন্য স্টুডেন্টস্ হেলথ হোমের হয়ে স্বাস্থ্য আন্দোলনে প্রভূত সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকেন, কিন্তু স্টুডেন্টস্ হেলথ হোম থেকে তাঁরা কোন স্বাস্থ্য পরিষেবা পান না। হেলথ হোম শিক্ষকদের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু করুক এই আকুতি ছিল শিক্ষক সমাজের।

এদিকে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির রাজ্য দপ্তরে টিচার্স হেলথ হোমের অঙ্গ হিসেবে চোখ এবং নাক-কান-গলার (ই এন টি) ক্লিনিক চালু ছিল। কিন্তু কালক্রমে তা বন্ধ হয়ে যায়। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে স্টুডেন্টস্ হেলথ হোমকে অনুরোধ করা হয় তারা শিক্ষকদের জন্য কোন পরিষেবা চালু করতে পারে কি না। সমিতির আবেদনক্রমে স্টুডেন্টস্ হেলথ হোম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য কলকাতার মৌলালীতে অবস্থিত বাড়ীতে ৬টি বিষয়ে সান্ধ্য স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু করা যাবে। সেগুলি ঃ চোখ, নাক-কান-গলা, নিউরোলজি, কার্ডিওলজি, দাঁত এবং মধুমেহ রোগের চিকিৎসা হোমের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হবে। এই পরিষেবা ১লা জুলাই থেকে চালু হয়েছে। এই পরিষেবা গ্রহণ করার জন্য হোমের পক্ষ থেকে একটা কার্ড দেওয়া হচ্ছে। এই কার্ডে ছবি লাগিয়ে স্কুল থেকে সিলমোহর সহ স্বাক্ষর করিয়ে আনতে হবে। এটা হবে তাঁর পরিচয়পত্র। এই কার্ড নিয়ে বিকেল চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে হোমের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গিয়ে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে নির্ধারিত দিনে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। পাঁচটার পর ডাক্তারবাবু রোগী দেখবেন। প্রতিবার পরামর্শ গ্রহণের জন্য গ্রহীতাকে পঞ্চাশ টাকা অনুদান হিসেবে হোমকে দিতে হবে। ইউ এস জি, ই সি জি, ই ই জি, প্যাথলজি, বায়োকেমিষ্ট্রি, এণ্ডোস্কপি, অডিওমেট্রি এবং একস্-রে ইত্যাদি আধুনিক পরীক্ষা ন্যূনতম অনুদানে 'হোম' থেকেই করা যাবে। রক্ত নমুনা সংগ্রহ করা হবে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত। অন্যান্য পরীক্ষার জন্য পরামর্শ গ্রহণের দিন নাম নথিভুক্ত করে যেতে হবে।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি স্টুডেন্টস্ হেলথ হোমকে ইতিমধ্যে তাঁদের আবেদনক্রমে ১২ লক্ষ টাকা দিয়ে চক্ষু সংক্রান্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি কিনতে সাহায্য করেছে। স্টুডেন্টস্ হেলথ হোম একটা কক্ষকে নির্ধারিত করেছে চক্ষু সংক্রান্ত চিকিৎসার জন্য। ঐ কক্ষটির নামকরণ হয়েছে 'অনিলা দেবী' কক্ষ। ছানি কাটানোর জন্য ছয়জন প্রতি শনিবার ভর্তি হয়ে রবিবার সকালে ছানি কাটিয়ে রবিবার বিকেলেই ছুটি পেয়ে যাবেন। এর জন্য যৎসামান্য অর্থ ব্যয় হবে।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি ইতোমধ্যেই ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্টুডেন্টস্ হেলথ হোমে ৪টি বেড রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থদান করেছে। "রোগ হলে চিকিৎসা, অথবা রোগ যাতে না হতে পারে তার ব্যবস্থা" — এই স্লোগানকে সামনে রেখে স্টুডেন্টস্ হেলথ হোমের স্বাস্থ্য আন্দোলনের সঙ্গে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি দীর্ঘদিন থেকেই যুক্ত থেকেছে। স্টুডেন্টস্ হেলথ হোম কেবল স্বাস্থ্য পরিষেবা নয়, এটি একটি সেলফ্ হেলপ মুভমেন্ট। এই স্বনির্ভরতার আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে স্টুডেন্টস্ হেলথ হোমকে ৭০টি শয্যাবিশিষ্ট একটা হাসপাতালও পরিচালনা করতে হচ্ছে এবং সারা পশ্চিমবঙ্গে ৫৪টি আঞ্চলিক কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। হোমের চিকিৎসা খাতে প্রভূত অর্থ ব্যয় হয়। এই অর্থ কেবলমাত্র ছাত্র-ছাত্রীদের দেয় অর্থ থেকে সংকুলান হয় না। দিনে দিনে ওষুধের দাম যে পরিমাণে বাড়ছে তাতে অর্থ সংগ্রহের জন্য হোমকেও নানান ধরনের পরিকল্পনা করতে হচ্ছে। শিক্ষকদের জন্য সান্ধ্য স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্লিনিক থেকে সংগৃহীত অর্থ হোম পরিচালনার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। আবার শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীবন্ধুরা নানান নার্সিংহোমে প্রতারিত হয়ে থাকেন। বিভিন্ন জেলা থেকে যাঁরা কলকাতায় চিকিৎসার জন্য আসেন তাঁরা অনেকেই সঠিক চিকিৎসার উৎস সন্ধান করতে পারেন না। স্টুডেন্টস্ হেলথ হোম এই বিষয়ে শিক্ষকবন্ধুদের দিক্‌নির্দেশ করতে পারে। পরিষেবা গ্রহীতাদের পরিচিতিপত্র পাওয়া যাবে সমিতির বিভিন্ন দপ্তরে অথবা স্টুডেন্টস হেলথ হোমের বিভিন্ন রিজিওনাল কেন্দ্রে। এই পরিষেবার নির্ঘন্ট নিম্নরূপ ঃ

সোমবার	ঃ	মধুমেহ, স্নায়ু, চোখ।
মঙ্গলবার	ঃ	চোখ, হৃদ্‌রোগ।
বুধবার	ঃ	চোখ, নাক-কান-গলা, হৃদ্‌রোগ এবং দাঁত।
বৃহস্পতিবার	ঃ	মধুমেহ, চোখ, নাক-কান-গলা।
শুক্রবার	ঃ	চোখ, নাক-কান-গলা, হৃদ্‌রোগ।
শনিবার	ঃ	স্নায়ুরোগ (দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার), নাক-কান-গলা।

প্রতিবেদন

প্রকাশিত হল নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি কর্তৃক সংকলিত 'আচার্য কাহিনি'

গত ২০শে জুন, ২০০৪ সত্যপ্রিয় ভবনে রবিকক্ষে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি কর্তৃক সংকলিত "আচার্য কাহিনি" গ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন মাননীয় বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন সমিতির সভাপতি ক্ষমা ভট্টাচার্য। সূচনায় তিনি বলেন, "আচার্য কাহিনি" গ্রন্থখানির প্রকাশনার বিষয়ে সমিতির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমল ব্যানার্জী উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর বাক্‌যন্ত্র বিকল হবার দরুণ তিনি ছুটিতে থাকার জন্য এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেন নি। তাঁর এই অনুপস্থিতিতে সাময়িকভাবে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য আমরা দুঃখিত। তবে আনন্দিতও বটে, কারণ তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে।

'আচার্য কাহিনি' গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করছেন বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় কান্তি বিশ্বাস।

অতিথিদের পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মিত্রা ভট্টাচার্য বলেন, বইটিতে প্রকাশের যে সময় দেওয়া আছে সেই সময়ে প্রকাশ করা গেল না আজ প্রকাশিত হচ্ছে — এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত। সাধারণ সম্পাদক অমল ব্যানার্জীর অসুস্থতার কারণে এই বিলম্ব ঘটেছে। যে পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন তাকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন রামরমণ ভট্টাচার্য এবং সমগ্র সংগঠন তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই বইটা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বিগত বছরগুলিতে সমিতি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষার জন্য আন্দোলন করার আহ্বান জানিয়েছে এবং ব্যাপকভাবে প্রচার করেছে। তার ফলে আমাদের আচার্যকূল নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও দৈনন্দিন শিখন কাজে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে আত্মনিয়োগ করেছেন। এটাই হচ্ছে আচার্যকূলের প্রকৃত চেহারা। আজকে প্রচার মাধ্যমগুলি আচার্যকূলকে যে জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে বাস্তবে কিন্তু আচার্যকূলের প্রকৃত চেহারা সেটা নয়। এবং সেই কারণেই যেকোন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সমাজে সামনের সারিতে এসে নেতৃত্ব দান করেছেন আচার্যকূল। এটা মানুষের সামনে, শিক্ষককূলের সামনে তুলে ধরা আমাদের কর্তব্য বলে আমরা মনে করেছি। আমাদের এটা একটা দায়িত্বও বটে। সেই দায়িত্বকে রূপায়িত করার জন্যই আমরা "আচার্য কাহিনি" প্রকাশের ব্যবস্থা করেছি। আমাদের অসুস্থ সাধারণ সম্পাদক যাঁর পরিকল্পনা না হলে বইটা প্রকাশ হতো না সেই অমল ব্যানার্জী আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে না পারার দুঃখ প্রকাশ করছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি রামরমণ বাবুকে। উপস্থিত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

রামরমণ ভট্টাচার্য বলেন, প্রায় চার বছর ধরে এই বইটি

'আচার্য কাহিনি' গ্রন্থ প্রকাশ আনুষ্ঠানিক করছেন বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় কান্তি বিশ্বাস।

প্রকাশনার কাজ চলছে। আজ বইটি প্রকাশিত হলো এটা গর্বের এবং আনন্দের। অমলবাবু বইটি প্রকাশের ব্যাপারে যতটা পারেন, যেভাবে পারেন সাহায্য করেছেন। ব্যবসাগতভাবে করলে এক ধরনের বই হয়। কিন্তু "আচার্য কাহিনি"-তে আমরা শিক্ষা আন্দোলনকে ধরবার চেষ্টা করেছি। এটা ছিল আমাদের অনেক বছরের পরিকল্পনা।

এই গ্রন্থে যে কুড়িজন লেখকের গল্প নেওয়া হয়েছে তাঁরা সবাই প্রয়াত। শিক্ষকের ত্যাগ, তিতিক্ষা, ধৈর্য্য ইত্যাদি মানবিক গুণগুলিকে কেন্দ্র করে যে সব গল্প আছে — সেগুলিই এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। আমাদের সমিতির ৩০০-র ওপর আঞ্চলিক শাখা আছে। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার দেবার সময়, আমি নিজে দেখেছি, হাজার হাজার টাকার বই আমরা বাইরে থেকে কিনি। কেন আমরা "আচার্য কাহিনি" পুরস্কার হিসাবে দেব না? অঞ্চল, মহকুমা, জেলা নেতৃত্ব সচেষ্ট হলে এক বছরে ২০০০ বই বিক্রি হবে। এই কাজ করতে পেরে একজন সাধারণ কর্মী হিসাবে আমি নিজেকে ধন্য বলে মনে করছি।

মাননীয় বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস বলেন, আমি নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাবো এ ধরনের একটি গ্রন্থ প্রকাশ করতে তাঁরা উদ্যোগী হয়েছেন বলে। সমিতির সাধারণ সম্পাদক অমল ব্যানার্জী অসুস্থতার কারণে অনুপস্থিত থাকায় তিনি বেদনা অনুভব করেন।

আজকে এই সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থে প্রথমেই বিদ্যাসাগরের একটি রচনা দিয়ে সূচনা করা হয়েছে। একজন ব্যক্তি নিজের অর্থ থেকে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের যাবতীয় বেতন বহন করেছেন, ছাত্রীদের সাহায্য করেছেন, এইরকম ব্যক্তিত্ব গোটা পৃথিবীতে বিদ্যাসাগর ছাড়া আর কেউ আছেন বলে আমার জানা নেই। শিক্ষা, বিশেষ করে নারীশিক্ষার প্রসারে বিদ্যাসাগর যে ভূমিকা পালন করেছেন তা আমাদের পরম প্রাপ্তি। তিনি ভারতবর্ষের গৌরব, বিশ্বের গৌরব। তাই যথার্থভাবেই বিদ্যাসাগরের একটি রচনা দিয়ে এই গ্রন্থ শুরু করা হয়েছে।

আর একটি রচনা দেখলাম ওখানে স্থান পেয়েছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। নারায়ণ মাষ্টারের জীবনের দুঃখের কাহিনি। বিভূতিভূষণ উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বনগ্রাম মহকুমার গোপালনগর হরিপদ ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক ছিলেন। সেই বিদ্যালয়ে আমি কিছুদিন প্রশাসক ছিলাম। সেখানে বিভূতি সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা শুনেছি তাতে চমৎকৃত হতে হয়। একজন শিক্ষক কতখানি নিষ্ঠাবান হতে পারেন, কতখানি ছাত্রদরদী হতে পারেন, সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধে কীভাবে অনুপ্রাণিত হতে পারেন, বিভূতিভূষণের শিক্ষকতা জীবন থেকে সে কথা আমরা জানতে পারি। এই গ্রন্থখানি যে রচনা দিয়ে শেষ করা হয়েছে তা তপোবিজয় ঘোষের লেখা। ঐ লেখায় মাধব মাষ্টারের কথা বলা আছে। সেই মাধব মাষ্টার আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। আমরা গর্ববোধ করতে পারি এইসব শিক্ষকদের জন্য। শিক্ষার জগতে বাংলার যে অবদান তা ভোলবার নয়। শিক্ষার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে বাংলা। আজ শিক্ষাজগতে যদি কেউ নৈরাজ্য আনতে চায়, শিক্ষাকে কলুষিত করতে চায়, আমার একান্ত বিশ্বাস, বাংলার মাটি থেকে তার বিরুদ্ধে যথার্থ প্রতিবাদ ধ্বনিত হবে।

অন্য রাজ্যের তুলনায় এরাজ্যে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের

সুযোগ-সুবিধা কিছুটা বৃদ্ধি করা গেছে, কিন্তু এখনও শিক্ষক জীবনের দুঃখ-কষ্ট বিদ্যমান। তাঁদের বৃত্তিগত অসুবিধা আছে, আবার দায়িত্ব পালন করবার ক্ষেত্রেও অনেক অসুবিধার মধ্যেও তাঁদের কাজ করতে হয়। আমরা গত ২৭বছরে সর্বাধিক সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করেছি, সর্বাধিক সংখ্যক অতিরিক্ত শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করেছি, কিন্তু ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তার থেকেও বেশী। শিক্ষক অনুপাতে ছাত্রের সংখ্যা গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের রাজ্যে বেশী। এই বিশালসংখ্যক শিক্ষার্থীকে শ্রেণীকক্ষে বসিয়ে শিক্ষকের পক্ষেও যথোচিতভাবে দায়িত্ব পালন করা একজন বিদ্যালয় শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব নয়। সেই কঠিন কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষক সমাজ করে চলেছেন। বাংলার এই আচার্যকূল আমাদের কাছে নমস্য, তাঁরা শ্রদ্ধাস্পদ। বিদ্যালয়ে পরিকাঠামোর অভাব আছে। শ্রেণীকক্ষের অপ্রতুলতা, বিজ্ঞানাগারের অভাব, গ্রন্থাগারের অপ্রতুলতা এই সমস্ত অসুবিধা আছে। এ সব অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও বাংলার আচার্য-শক্তি বাংলার শিক্ষক সমাজ একেবারে প্রাথমিক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন তার জন্য আমরা গর্ব অনুভব করি। বাংলার মাটিতে থেকে যতটা না বুঝতে পারি বাংলার বাইরে যখন বিভিন্ন রাজ্যে যাই তখন তাঁদের মুখ থেকে শুনতে পাই এই বাংলার আচার্য-শক্তির উজ্জ্বল ভূমিকার কথা। আবার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম কখনো কখনো কোন শিক্ষকের কোন ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি তারা এমনভাবে প্রকাশ করেন যেগুলো পড়বার পরে সমাজের শিক্ষক সম্পর্কে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। যাঁরা আমরা শিক্ষক, লজ্জায় আমাদের মাথা নিচু হয়ে যায়। এই সমস্ত বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। যে শিক্ষক নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন, যাঁরা কর্তব্য পালনে অবিচল থেকেছেন সমাজ তাদের কয়জনের কথা জানতে চায়? বসিরহাটের একজন শিক্ষক যাঁকে চকলেট দাদু বলে, তাঁর কথা কে জানতে চায়? সারাজীবনের সঞ্চয় দিয়ে ছেলেমেয়েদের জন্যে চকোলেট কিনে বিতরণ করেন। মেটিয়াব্রুজের একজন শিক্ষক সারা জীবনের যে গ্র্যাচুইটির টাকা পেয়েছিলেন, পেনশনের টাকা পেয়েছিলেন সেগুলো এবং বিষয় সম্পত্তি সবই বিক্রি করে দিয়ে স্কুলকে বড় করে তুলেছেন, ছাত্রদের সাহায্য করেছেন। প্রচার মাধ্যমে তাঁদের কথা স্থান পায়না। স্থান পায় শিক্ষককূলের মুখে যাঁরা কলঙ্ক লেপন করছেন তাঁদের কথা। যাঁরা আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছেন, তাঁদের কথা ছাপা হয় না। এই কারণে যে ওই খবরের নাকি কোনো নিউজভ্যালু নেই। এই জন্য শিক্ষকদের আরো বেশী সচেতন থাকার দরকার। তবে যাঁরা নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক তাঁরা ঠিকই মানুষ গড়ার কাজ করে চলেছেন। প্রচার মাধ্যমে তাঁদের নাম প্রচারিত হোক বা না হোক, তাঁরা তার দিকে ভ্রুক্ষেপ করেন না। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ব্যথা থাকতে পারে, বেদনা থাকতে পারে, দুঃখ থাকতে পারে, কষ্ট থাকতে পারে কিন্তু আচার্য-শক্তি স্বীয় কর্তব্যে অবিচল থাকবেন স্বাভাবিকভাবেই সেটা আশা করা যায়।

এই গ্রন্থখানি আরো সুসমৃদ্ধ হোক, পরবর্তী সংস্করণে এবং পরবর্তী খণ্ডে আদর্শ শিক্ষকের, নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকের আরো দৃষ্টান্ত প্রতিফলিত হোক। তাতে যাঁরা নবাগত শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী, তাঁরা অনুপ্রাণিত হবেন। শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আরো বেশী সচেতন হবেন।

পুনর্বার আপনাদের সকলকে এবং গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে যাঁদের ভূমিকা আছে, তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর যাঁদের লেখা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে সেই সমস্ত মরণজয়ী মনীষীদের প্রতি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন

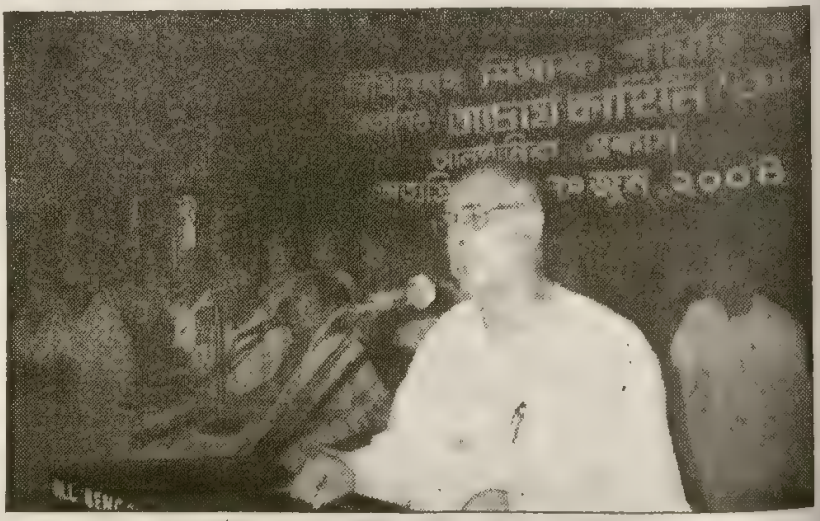

অনুষ্ঠানে ভাষণরত সমিতির বর্ষীয়ান নেতা অরুণ চৌধুরী

করে আমি আমার কথা শেষ করছি।

সমিতির প্রবীণ নেতা শ্রদ্ধেয় অরুণ চৌধুরী বলেন, যে বিষয়কে কেন্দ্র করে এই গ্রন্থটি সংকলিত হয়েছে সেটা হচ্ছে শিক্ষকদের জীবন ও আদর্শবোধ। বাংলা সাহিত্যের প্রতিভাবান লেখকরা তাঁদের গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকদের ভূমিকাকে। কিভাবে তাঁদের আদর্শবোধ সামাজিক জাগরণে সহায়ক হয়েছে তার বর্ণনা দিয়েছেন। আবার সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কি দায়িত্ব হওয়া উচিত, সমাজের কি দায়িত্ব হওয়া উচিত সেগুলোও প্রকারান্তরে তাঁরা গল্পের মধ্যদিয়ে তুলে ধরেছেন। এখন এগুলো বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। একটি মূল্যবান দিক। এখন সেই বিশেষ দিকটি এই সংকলনে তুলে ধরা হয়েছে। এই বিশেষ দিকটি তুলে ধরে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের একাংশ।

একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন।

আমাদের দেশের ঔপনিবেশিক শাসকরা এদেশে শিক্ষার বিস্তারে প্রতিপদে বাধা দিয়েছেন। সেইসব বাধাকে অতিক্রম করে আমাদের শিক্ষার প্রবাহ চলেছে। আর সমাজকে আলোকিত করা, দেশের মানুষকে শিক্ষিত করার গুরু-দায়িত্বটা শিক্ষকরাই বহন করে চলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের যে কাহিনিটা এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, সেখানে মাষ্টার মশাইকে গুরুমশাই বলা হয়েছে। সেই গুরুমশাইরাই তখন থেকেই শিক্ষার প্রদীপটাকে জ্বালিয়ে রেখেছেন। পরবর্তীকালেও শিক্ষকরাই আদর্শের ধারাটিকে উর্দ্ধে তুলে ধরেছেন। আমাদের শিক্ষক সমাজের এটাই বড় সম্পদ। বাংলার শিক্ষকরা নিজেদের শুধু বৃত্তিভোগী বলে মনে করেন নি, শিক্ষা দেওয়াটাকে তাঁরা একটা বিরাট কাজ বলে মনে করেছিলেন। 'যতই করিবে দান ততো যাবে বেড়ে' এই নীতিতে অনুপ্রাণিত হয়েই শিক্ষককুল এই কাজটা করে চলেছেন। অনেক বাধা বিঘ্ন এসেছে তাঁদের জীবনে, বিশেষ করে দারিদ্র্যের কষাঘাত তাঁদের জীবনকে যারপরনাই বিপর্যস্ত করেছে। এর মাঝখানে দাঁড়িয়েই তাঁরা কিন্তু শিক্ষাদানের কাজটা করেছেন। সংকলিত গল্পগুলোর ভেতর এগুলিই প্রধান দিক হিসাবে দেখতে পাওয়া যাবে। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমাদের সমিতি। এই প্রতিষ্ঠার পেছনে একটা বড় লক্ষ্য ছিল শিক্ষার ধারাটাকে কি করে আরও ভালোভাবে প্রবাহিত করা যায়। শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটাতে, দেশকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে শিক্ষকরা সংগঠিত হওয়ার তাগিদ অনুভব করেছিলেন। কি করে দেশের সন্তানদের মানুষের মতো মানুষ করা যায় এটাই প্রধান ভাবনা ছিল তখন। সংকলিত গ্রন্থের কাহিনিতে এই ভূমিকাকেই তুলে ধরা হয়েছে।

জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষক সমাজের এক বিরাট ভূমিকা ছিল। প্রত্যক্ষভাবে কেউ কেউ অংশগ্রহণ করেছেন জাতীয় আন্দোলনে। কেউবা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, কেউবা অন্তরালে থেকে কাজ করেছেন, কেউবা ছাত্রদের স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এই দিকটাও লেখকরা তুলে ধরেছেন বিভিন্ন কাহিনির ভেতর দিয়ে।

'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে তারাশঙ্কর-সৃষ্ট শিবু চরিত্রটিতে দেখতে পাই যে, শিবুর যা করণীয় তার নির্দেশ নিয়েছে শিক্ষকের কাছ থেকে। সামন্ততান্ত্রিক কর্তাব্যক্তিরা সেই শিক্ষককে বিদ্যালয় থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করেছে। শিবু কিন্তু তাঁকে ভুলে যায়নি। শিবু তাঁদের ডেকেছে। সেই মাষ্টার মশাই শিবুকে দেশের কথা ভাবতে শিখিয়েছে।

আবার তারাশঙ্করের 'সন্দীপন পাঠশালা' দেখতে পাই শিক্ষকদের সংগঠিত হতে। তারা সমিতি গড়ছে। এই সংগঠনের দিকটা তিনি তুলে ধরলেন।

১৯৪৬ সালে আমার মনে আছে, তখন আমি দশম শ্রেণীর ছাত্র, বাংলাদেশে ধর্মঘট করলেন প্রাথমিক শিক্ষকরা, মাধ্যমিক শিক্ষকরা তখন ধর্মঘট করতে পারেন নি। নানা টানাপোড়েনে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি তখন জড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষকরা ধর্মঘট করলেন সারা বাংলাদেশ জুড়ে। সেটাই ছিল ঐতিহাসিক ধর্মঘট। সেই ধর্মঘটের মুহূর্তে কবি আশরাফ সিদ্দিকি লিখেছিলেন "তালের মাষ্টার"। শিক্ষকের আদর্শবাদীতা, মূল্যবোধ, দায়বদ্ধতা ইত্যাদিকে গ্রন্থাকারে তুলে ধরা আজকের দিনে আরো বেশী দরকার বলে আমরা মনে করি। মনে রাখা দরকার, এখন আমরা বিশ্বায়নের ধাক্কা খাচ্ছি। তাই আদর্শের ওপর বেশী করে জোর দিতে হবে। আদর্শের ওপর বেশী করে জোর না দিলে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালনে আমরা ব্যর্থ হব। সমাজের যে অংশের মানুষেরা কোনকালে বিদ্যালয়ে আসতে পারেনি, তাঁরা আজকে বিদ্যালয়ে আসছে। তাদের নিয়ে নানা সমস্যা হচ্ছে, কিন্তু সমস্যাটাকে দূর করার কাজটা শিক্ষকদেরই করতে হবে। সেখানে হয়তো আমাদের একটু বেশী খাটতে হবে, বেশী ভাবতে হবে। আমাদের আরো একটু বেশী অধ্যবসায় দরকার হবে। কিন্তু এই কাজটা আমাদের অবশ্যই করতে হবে। তা হলে এই গ্রন্থের ভিতর দিয়ে যে শিক্ষকদের গুণাবলীর কথা তুলে ধরা হয়েছে, সেই গুণাবলীর প্রকৃত উত্তরসাধক হিসাবে আমরা আমাদের ভূমিকা পালন করতে পারব। আমি তো মনে করি, যে কাহিনিগুলো এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, সেই কাহিনিগুলোর সব ক'টার ভিতরেই কিন্তু এই আদর্শবোধের কথাটা, চরম দারিদ্র্য সত্ত্বেও শিক্ষা বিস্তারের জন্য শিক্ষকদের ঐকান্তিকতার কথাটা আছে। আমার মনে আছে, নরেন্দ্রনাথ মিত্র একটা গল্প লিখেছিলেন যে গল্পের কাহিনিটা এইরকম ঃ

একজন মাষ্টার মশাই পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছেন ; তাঁরই ছাত্র একটি অফিসের বড় অফিসার ; তাকে ধরে একটা কেরানীর চাকরী যোগাড় করেছেন, কিন্তু তার যে তিনি শিক্ষক এটা তিনি ভুলতে পারছেন না। কেরানীগিরির চাকরীতে তাঁর মন উঠছে না। সেইজন্য তিনি অফিসের ছুটির পরে ঐ অফিসে যাঁরা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন, যাঁরা পিওনের কাজ করতেন, যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন নিরক্ষর, তাঁদের নিয়ে আড়ালে বসে ক্লাস করতে শুরু করলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, একদিন তাঁরই ছাত্র সেটা দেখে রুষ্ট হলেন এবং মাষ্টার মশাই সেই চাকরী থেকে বরখাস্ত হলেন। এই যে শিক্ষক তিনি কিন্তু ভুলতে পারছেন না যে তাঁর দায়িত্বটা হচ্ছে মূলত মানুষকে শিক্ষিত করা, নিরক্ষর মানুষের কাছে শিক্ষার আলো বিস্তার করা। এইটা একটা অত্যন্ত গৌরবজনক ভূমিকা শিক্ষকদের।

যাই হোক, আমি উদ্যোক্তাদের আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি রামরমণবাবুকে যিনি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফ থেকে সংকলনের কাজটা করেছেন, গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। এই বইটা প্রচারিত হওয়া দরকার। আশা করি, সে কাজে সমিতির বন্ধুরা সবাই উদ্যোগী হবেন। এই কথা বলে সবাইকে আবার ধন্যবাদ, নমস্কার জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি।

— নিজস্ব প্রতিনিধি

প্রতিবেদন

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সর্বশিক্ষা অভিযান আয়োজিত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের অভিমুখীকরণ কর্মশালা

(অংশগ্রহণমূলক)

২রা জুলাই — ৪ঠা জুলাই, ২০০৪ ❐ স্থান ঃ শিলিগুড়ি বিবেকানন্দ বিদ্যালয়, হাকিমপাড়া

গত ২রা জুলাই থেকে ৪ঠা জুলাই, ২০০৪ শিলিগুড়ি বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সর্বশিক্ষা অভিযান আয়োজিত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের অংশগ্রহণমূলক অভিমুখীকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো। ২রা জুলাই এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুর নগর উন্নয়ন মন্ত্রী মাননীয় অশোক ভট্টাচার্য। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে মানবোন্নয়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার যখন স্বাস্থ্যখাতে ৪০ শতাংশ ব্যয় করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্যয় করে ৭০ শতাংশ। শিক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত ২৭ বছরে যতটা সাধ্য

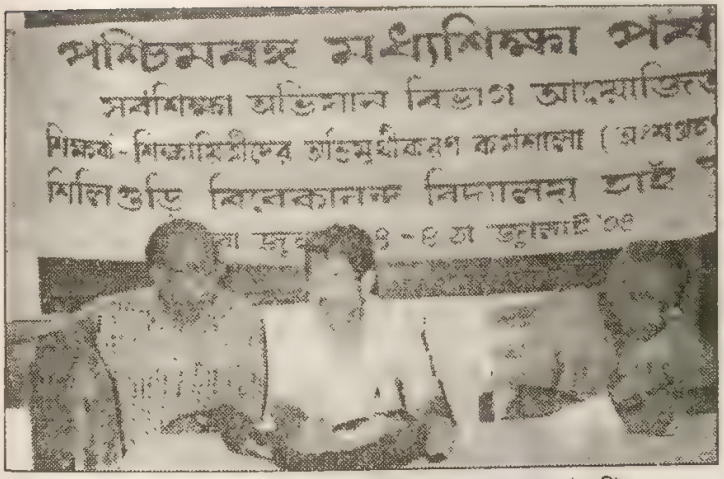

শিলিগুড়ি বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ে কর্মশালা উপলক্ষে মঞ্চে উপবিষ্ট প্রশান্ত ধর, সমীর ভট্টাচার্য ও সমর সাহা।

অর্থ ব্যয় করেছে। শিক্ষার জন্য ক্ষুধা বেড়েছে। ছাত্রছাত্রীর জোয়ার এসেছে বিদ্যালয়গুলিতে। এখন চাই দক্ষ পরিকল্পনা ও সংবেদনশীলতা দু'টিরই অভাব; এখনও যারা বিদ্যালয়ে আসেনি, বিদ্যালয়ের বাইরে আছে তাদের ডেকে আনতে হবে। এটাই সর্বশিক্ষা অভিযানের মূল কথা। পঞ্চায়েত, পৌরসভা, গণসংগঠন — সকলকে একযোগে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে হবে। Enrolment বড় কথা নয় — Review চাই প্রতি পদক্ষেপে। মুখ্যসম্পন্ন ব্যক্তি (Key Resource Person) হলেই হবে না, চাই সর্বশিক্ষা অভিযানের সঙ্গে আরও বেশী বেশী করে যুক্ত হওয়া। শিলিগুড়ি বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সমবেত উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে। বক্তব্য রাখেন শিলিগুড়ি মহকুমা শাসক গোপাল লামা, জেলা প্রকল্প আধিকারিক নিতাই পাল। মুখ্য সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন পর্ষদ-সদস্য অমর সাহা। সামগ্রিক বিষয়টি উত্থাপন ও কর্মশালার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন পর্ষদ কর্তৃক নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ বিনয় সরকার। ১৫টি মহকুমার ৯০জন অংশগ্রহণকারী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ৮টি দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন। তার আগে শিক্ষাবিদ্ প্রশান্ত ধর প্রাঞ্জল ভাষায় কর্মশালায় কি করণীয় তা ব্যাখ্যা করে দেন। কর্মশালা সংক্রান্ত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সমীর ভট্টাচার্য ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কার্যকরী-শিখন-দিবস বছরে ২০০দিন করার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ৩রা জুলাই সারাদিন দলগত আলোচনা চলে সমাজ বিকাশে বিদ্যালয়ের ভূমিকা, নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন, সংশোধনী পাঠ, পাঠক্রমিক ও সহ-পাঠক্রমিক (ন্যূনতম ২০০দিন) বর্ষপঞ্জী প্রভৃতি বিষয় নিয়ে। বিশেষজ্ঞরা দলগুলিকে পরামর্শ দিয়ে উৎসাহিত করেন।

শেষদিন অর্থাৎ ৪ঠা জুলাই এর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রশান্ত ধর। দলপতিরা নিষ্ঠাসহকারে যে প্রতিবেদন পেশ করেন তা প্রশংসনীয়। বিশেষজ্ঞ সুময় রায় অত্যন্ত সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন এইদিন। We shall over come গানটি সমবেত কণ্ঠে গীত হয় সমাপ্তি সঙ্গীত হিসেবে।

কর্মশালায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারী শিক্ষক-শিক্ষায়িত্রীবৃন্দ

সমিতির দার্জিলিং জেলার সম্পাদক তমাল চন্দের নেতৃত্বে জেলার সদস্যরা এবং বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনিমেষ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সহকর্মিগণ এবং ছাত্রছাত্রীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে কর্মশালাকে সফল করেছেন। তাঁরা এ জন্য অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

— নিজস্ব প্রতিনিধি

প্রতিবেদন

সর্বশিক্ষা অভিযান

ওরিয়েন্টেশন অ্যাণ্ড ট্রেনিং অন জেনারেল অ্যাঅয়ারনেস অফ টিচার্স অফ দার্জিলিং গোর্খা অটোনোমাস হিল কাউন্সিল এরিয়াস

তারিখ ঃ ৭ই জুলাই-১০ই জুলাই, ২০০৪

অরগানাইজড বাই ঃ এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট অফ ডি জি এ এইচ সি

স্থান ঃ সেন্ট টেরিজা'স গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সর্বশিক্ষা অভিযান বিভাগের কর্মসূচি অনুযায়ী গত ৭ই জুলাই থেকে ১০ই জুলাই, ২০০৪ পর্যন্ত দার্জিলিং গোর্খা অটোনোমাস হিল কাউন্সিল এলাকার শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, বিদ্যালয় প্রধান এবং বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সদস্যদের অংশগ্রহণমূলক অভিমুখীকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

৭ই জুলাই প্রদীপ জ্বালিয়ে এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন এন কে কুমাই, একজিকিউটিভ কাউন্সিলর, সেকেণ্ডারী এডুকেশন, ডি জি এ এইচ সি। তিনি বলেন, ভারতীয় সংবিধান প্রণেতারা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, তাই তাঁরা সংবিধানে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বালক-বালিকাদের অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা কার্যকরী করার কথা বলেছিলেন। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় কেটে গেছে কিন্তু আজও এ ব্যাপারে সাফল্য আসেনি। এখন শুরু হয়েছে সর্বশিক্ষা অভিযান। এই অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হলো ঃ ২০১০ সালের মধ্যে যাতে সমস্ত শিশু আট বছরের বিদ্যালয় শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারে তা সুনিশ্চিত করা, জীবনের উপযোগী ও উন্নত গুণমানের প্রারম্ভিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা, ২০১০ সালের মধ্যে সমস্ত শিশুকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখা প্রভৃতি। শুধু বিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা নন, সর্বশিক্ষা অভিযানের সঙ্গে গোটা সমাজ যুক্ত। আজকে যে কর্মশালা হচ্ছে তাতে পর্ষদের বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত আছেন। আশা করব, তাঁদের পরামর্শে আপনারা উদ্বুদ্ধ হয়ে আরও দক্ষতার সঙ্গে, আরও অধ্যবসায়ের

দার্জিলিঙ-এ সর্বশিক্ষা অভিযান কর্মশালায় মঞ্চে উপবিষ্ট পর্ষদ-বিশেষজ্ঞ প্রশান্ত ধর, অজিত সাহা, বিনয় রায় ও সুময় রায়।

সঙ্গে আপনারা বিদ্যালয় পরিচালনা করবেন, শ্রেণিকক্ষে ছাত্রছাত্রীদের পঠন-পাঠনকে উন্নত করবেন, সর্বশিক্ষা অভিযানকে সফল করবেন। আমি এই কর্মশালার সাফল্য কামনা করছি। পর্ষদ বিশেষজ্ঞ ও অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা বরণ করে নেন।

পর্ষদ বিশেষজ্ঞ সমীর ভট্টাচার্য কর্মশালার উদ্দেশ্য ও ভিত্তিপত্রের বিষয়বস্তু বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। মোট দশটি দলে ৬০ জন অংশগ্রহণকারীদের ভাগ করে নেওয়া হয় দলভিত্তিক আলোচনার জন্য। আলোচনার বিষয়বস্তুগুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ

1) Enrichment of classroom transaction, 2) Calendar of academic activities ensuring 200 learning days, 3) Gradual development of formal education system and its fartherance, 4) Continuous evaluation remedial lessons — grading system, 5) Role of the Head of the institution, 6) Universalisation of elementary education — Planning and Implementation, 7) Role of Managing Committee in ensuring EFA, 8) Evolutionary changes of M C : Community participation for betterment of academic atmosphere in and outside institution, 9) school cluster/ complex for promotion of academic excellence, 10) Professional ethics of persons working in the field of education. আলোচনা চলল সারাদিন। পর্ষদ বিশেষজ্ঞরা সাহায্য করলেন আলোচনা চলাকালে। ৮ই ও ৯ই জুলাই দলগত আলোচনা চলল। দার্জিলিং-এ জেলা পরিদর্শক প্রতাপকুমার মিত্র সবসময় আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। ঠিক একইভাবে সহযোগিতা করেছেন DGAHC-র অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি মিঃ ঠাকুরী ও এডুকেশন অফিসার মিঃ ঘনশ্যাম মণ্ডল।

১০ তারিখে Valedectory Session শুরু হলো শিক্ষাবিদ্ পর্ষদ বিশেষজ্ঞ প্রশান্ত ধরের নেপালী ভাষায় গাওয়া সঙ্গীত দিয়ে। গান গাওয়ার পর প্রশান্ত ধর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন। একে একে দলনেতারা তাঁদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর রিপোর্ট পড়লেন। দলনেতাদের মধ্যে ছিলেন Sister Elizabeth Chatterji, Ranjana Yenjore, O T Aden, Ashoke Tamang, Father Peter, Udoy Kumar Thapa, D B Chhetri, Raju Thatal, Siddhartha Rai এবং Deep Waiba. শিলিগুড়ি থেকে যাঁরা এই কর্মশালা পরিচালনায় পর্ষদের সহায়ক হিসাবে কাজ করেছেন তাঁরা হলেন দেবাশিস চক্রবর্তী, রীতা গুরুং, ভরত প্যাটেল, তমাল চন্দ এবং পর্ষদের উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক কেন্দ্রের অফিসার কর্মশালার সাফল্যের জন্য সহযোগিতা করেছেন সবসময়। দলনেতার প্রতিবেদনের ওপর বিস্তৃত বক্তব্য রাখেন পর্ষদ বিশেষজ্ঞ অজিত সাহা এবং সুময় রায়। মাননীয় এন কে কুমাই সমাপ্তি ভাষণ দেন। সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডি কে ঠাকুরী। সমগ্র কর্মশালা পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা রচনা ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারীদের সহায়তাদানে যিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি হলেন পর্ষদ বিশেষজ্ঞ বিনয় রায়, তাঁর অন্যতম সহযোগী ছিলেন পর্ষদ বিশেষজ্ঞ শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এই কর্মশালা চলাকালীন মাননীয় জেলা পরিদর্শক প্রতাপকুমার মিত্র দার্জিলিং জেলার স্কুলগুলিকে নিয়ে Key Resource Person-দের সহায়তায় বিদ্যালয়গুলিতে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত করবার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করেন।

—নিজস্ব প্রতিনিধি, শিক্ষা ও সাহিত্য

কবিতা

২২শে শ্রাবণে কবিকে

উৎপল ঘোষ
গোপালী আই এম হাইস্কুল, পশ্চিম মেদিনীপুর

শ্রাবণ-বেলায় আঁধার মেঘে বৃষ্টি ঝরায় শুধু।
ভরে গেছে দিগন্ত ঐ নদী-চরের ধূ-ধূ।।
বর্ষালী মেঘ উড়ে চলে
বাদলা বাতাস কথা বলে
ঘনঘোর এই মধুর দিনে মিলনতায় ভরা।
তবু তোমার চলে যাবার ছিল এত ত্বরা?

এমনদিনেই তারে নাকি বলা শুধু যায়।
এমনদিনেই ভরা গাঙে মাঝি খেয়া বায়।।
মেঘের কোলে গুরু গুরু
ভরা নদীর যাত্রা শুরু
বকুল-প্রিয়া বসে আছে বাসর জেগে ওই।
কোথায় গেলে পথভোলা— এলে তুমি কই?

তোমার তরে যাত্রাপথে আনন্দ-গান বাজে।
তোমার তরে ভালোলাগা শত বেদন মাঝে।।
দুঃখ-দহন নেইকো সেথা,
তোমার কিরণ পড়ে যেথা,
ভুবন রাঙায় আলোকমালায় মেঘভাঙা ঐ রবি।
কেন তবে চলে গেলে বল তুমি কবি?

জল-ভরানো মাঠের বুকে রৌদ্র করে খেলা।
দিকে দিকে ফুলে ফুলে মত্ত অলির মেলা।।
রৌদ্র-ছায়ায় খেলা চলে
সারা-বেলা পলে-পলে
প্রকৃতিরই প্রাণের মাঝে সদাই উঠে ঢেউ।
তুমি ছাড়া তারে এমন বুঝবে কি আর কেউ?

আজকে কেন শ্রাবণী-দিন কেঁদে কেঁদে সারা?
বনবীথি তরুর শ্রেণী শুধুই তন্দ্রাহারা।।
তুমিও কি এমন করে
ঘুমহীন এই শ্রাবণ-ভোরে
নাকি তোমার বুকের মাঝে বৃষ্টি ঝরেই চলে?
যেথা তুমি যাওনা কেন — আমায় যেও বলে।।

এপার ওপার

তারাপ্রসাদ সাঁতরা
বাঁশবেড়িয়া উচ্চবিদ্যালয়, হুগলী

চাঁদ এপারেও ওঠে, ওপারেও
চাঁদের কল্পনা নিয়ে এপারে
কবিতার শরীর।
ওপারে চাঁদ-বুকে চিরকাল
শুয়ে আছে ওরা, অনন্ত ভোরের আশায়।

এপারে কুয়াশা নেই
বাড়ি, গাড়ি, ট্রাম স্বচ্ছ
সমুদ্র, নদী, ঢেউ চঞ্চলতায় মধুর নারী-পুরুষ.....
কবির শব্দও তাই গভীর ব্যঞ্জনাবহ।

ওপারে মাটির উপর
জীবনের দিনলিপি আঁকা
জীবনের মতোই চিরকালীন স্যাঁতস্যাঁতে
ঘরের মাটি।
দৃষ্টি নেই—না পেছনে, না সামনে
সময় থমকে আছে গভীর জলের ভিতর।

কে জানে, কবে
পৃথিবীর নরম শরীর জুড়ে
বিষ উঠে আসে
পাথর সরিয়ে নিঃশ্বাস নিতে নিতেই
দিন যায়..... নতুন আগাছা জমে।
পৃথিবীর সমস্ত গরল পান করে শুয়ে থাকে
একা, একটি পারে — নদী, সমুদ্র এবং নক্ষত্রেরা।

ওপারের গাছগুলিতে ফুল ফুটলেই
সাঁই-সাঁই..... ঢিল।
বোঁটা খসে পড়ে, পাতা.....
হাওয়াও নিঃশব্দে বয়
ঝড় হলে আগুন জ্বলে ওঠে।

সভ্যতার দুঃসময় চলছে

সৈয়দ আব্দুল হামিদ, সহ-শিক্ষক
তিলন উচ্চ বিদ্যালয়, দক্ষিণ দিনাজপুর

সভ্যতার বড় দুঃসময় চলছে—
ঘন্টা বাজছে, মৃত্যুঘন্টা মাঝে
সারি সারি বক সব—
কফিনের দস্তানায় নীরব
নিস্পন্দ, নিষ্প্রাণ — তুষার ধবল শিখর
ঢেউ তুলে ফেনিল সাগর নিথর,
অমৃত নয়, ক্লেদ সেথা ভাসছে—
সভ্যতার বড় দুঃসময় চলছে।
নগ্ন বিভীষণ, বিভীষিকাময় ধ্বংস—
শৃগাল-কুকুরে খায় শকুনের মাংস,
বিকৃত-থ্যাতলানো-হলকা অনল ঝলসানো
রক্ত-বারুদের গন্ধ মাখানো,
ধ্বংসের মাঝে উল্লসিত মরুভূমি
নগর, জনপদ, ক্ষেত-জলা-জমি
বিনাশ বিষাদে প্রহর গুনছে—
সভ্যতার বড় দুঃসময় চলছে।
নজিরবিহীন কদর্যতা-লোলুপতার আশীর্বাদ
লেলিহান প্রসারিত সাম্রাজ্যবাদ,
করাল থাবার গ্রাসে বিবশ ধরণী মূর্ছিত
বিনাশ আস্ফালনের কাপুরুষতায় মনুষ্যত্ব ধর্ষিত
বিকারগ্রস্ত সভ্যতার মানুষ মারার কৌশল —
পরিপুষ্ট করে তাদের তাঁবেদার — নপুংসকের দল
হিংসা-বিনাশ-সর্বনাশ ডাকছে—
সভ্যতার বড় দুঃসময় চলছে।

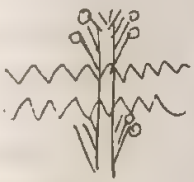

এ কী ভাষার মালা

ননীগোপাল জানা, উত্তর ২৪ পরগণা

বেরিয়ে যায়নি প্রতিরোধের প্রাণবায়ু
বুকে ছিল গুলিবিদ্ধ পাখির কষ্ট
মরে যেতে যেতে অপূর্ব সজীবতায়—
বেঁচে উঠল অপরূপ শস্যক্ষেত।

মুক্তি

রতিকান্ত মালাকার, প্রধান শিক্ষক
বাকসাড়া হাইস্কুল, হাওড়া

শীতের দিনে সকাল বেলায়,
রোদ পোহাতে দেখি,
দু'টি শালিক বসে আমার,
ছাদের উপর একি!

মনে হল ভাই-বোন ওরা,
মিল তাই বিস্তর।
খানিক দূরে বসে ওদের,
আর এক সহোদর।

ডেকে নিয়ে কাছে ওদের,
কি যেন সব বলে।
বোঝা গেল পেয়েছে ছাড়া,
খাঁচাখানি ফেলে।

বন্ধন মুক্তির আনন্দের,
স্বাদ পেয়েছে ওরা।
তাই ওদের কথা বলা,
হিসেবে যায় না ধরা।

বেজেছে বিউগল

বরুণচন্দ্র পাল, সহ-শিক্ষক
পিড়রাবনী হাইস্কুল, বাঁকুড়া

দ্বিধাদ্বন্দ্ব মুছে যেখানে উচ্চারিত হয়েছে কালের মন্দিরা
বৈপরীত্যের মাপকাঠিতে সেখানে ভেতরের সুগন্ধি
অথবা বৈভব ফসল ;
বিচরণ তোমার ব্যাপ্ত চরাচরে ; তপস্যার নির্জনতায়.....
রেখে যেতে প্রজন্মের কাছে
বন্ধ্যাত্বের উর্ব্বরতা বেড়ে যায় পাছে
সংগোপনে মিলেমিশে ফুল ফুটানোর সকল আয়োজন!

মুক্ত করো হে বন্ধু যুক্ত করো সবার আমন্ত্রণ.....
সখ্য হোক আদিগন্ত বিশ্ব পারাবারে—
লক্ষ্য হোক সর্বহারার শিকল ভাঙার গান ;
পায়ে পায়ে অনুষ্টুপ ছন্দে আরবার জাগুক সারথি ;
..... সরিয়ে রেখে চোখের জল.....

রণভূমে নিজবাস পরে নাও সখা
বেজে উঠেছে গণ-আন্দোলনের বিউগল!

তিতাস নদীর পরস্তাব

নিখিলেশ রায়
বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, দার্জিলিং

স্বপ্ন দেখার দুদিন বাদে স্বপ্ন গেল ছিঁড়ে
স্বপ্ন আমার ভোরের শরৎ, ফটিক জল, এদিক-ওদিক বিদেশ-বিভুঁই
স্বপ্ন আমার গাঁঠের তবিল, পৌষ-ফাগুনে দুধকলমের চিড়ে

গ্রামের ভিতর ঘাসবাগিচায় লেপটে আছে কে-ও
দিঘির পাড়ে ভেল্লিমুঠো সরল কিশোর, ঢেউ গুনছে শ্যাওলা জলে
জল তো জল, জড়িয়ে নিচ্ছে জটার মতো বউলগাছের বৃদ্ধ শিকড়,
সে-ও !

আমি তবে দুদিন ছিলাম ? গ্রামে ? না এই আলোয় ?
কোথায় ছিলাম ? সূর্যদেশে রাত ডোবে না। আমরা এখন তলদেশের
নিরেট তরল !
শুকিয়ে আসা তিতাস নদীর পরস্তাবে মন দিয়েছি লক্ষ লক্ষ মালোয়।

মহাবিশ্বের কবিতা

নিখিলেশ রায়
বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, দার্জিলিং

চাঁদের থেকে ছিটকে আসা একটি খণ্ড আলোর ভিতর
অর্ধখানা আমি এখন শিউরে শিউরে হাজার জোয়ার
ভর করেছি ; সন্নিকটে তোমরা আমার প্রিয়বন্ধু
পংক্তি লেখো আমায় দেখে, আমার ভিতর আসতে চেয়ে

ছেঁড়া মেঘের ছিন্ন শোভা কতজনের ড্রয়িংরুমে
তৃষ্ণা ভরায়, তৃষ্ণা বাড়ায়, চল সমুদ্রে বেড়াতে যাব
নবম শ্রেণীর আনাড়ি গা তলিয়ে যাচ্ছে জলের তলে
গ্রামপ্রদেশে খোল করতাল একা একাই ভেসে বেড়ায়

বাকি অর্ধ অন্ধকারে খেলে যাচ্ছে ধূসরলিপি
চাঁদের কি দোষ, চাঁদের চেয়ে নিপুণ কে যে খেলতে থাকে
আমার হাতের তালুর উপর, বুধের গায়ে, রবির গায়ে.....
আমি এখন পূর্ণখানা মহাবিশ্ব আমার ঘরে।

বৃষ্টির বর্ণমালা

তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সহ-শিক্ষক
মশিয়াড়া উচ্চবিদ্যালয়, বাঁকুড়া

বৃষ্টি মানেই কুসুম কলি
বৃষ্টি মানেই প্রাণ
বৃষ্টি মানেই কাজল মেঘে
বাদল দিনের গান।

বৃষ্টি মানেই চাষির চোখে
স্বপ্ন ভোরের আলো
বৃষ্টি মানেই সবুজ মেলা
ঘুচবে আঁধার কালো।

বৃষ্টি মানেই নদীর তীরে
হঠাৎ কিসের ভয়
বৃষ্টি মানেই ভাঙন সেথা
সন্দেহ সংশয় !

বৃষ্টি মানেই মনের কোণে
বিদ্যুৎ চমকানি
বৃষ্টি মানেই ধুইয়ে দেবে
ব্যর্থ প্রাণের গ্লানি।

বৃষ্টি মানেই কোরাস গানে
সম্প্রীতি পায় ভাষা
বৃষ্টি মানেই এপার-ওপার
ভাসায় ভালোবাসা।

বৃষ্টি মানেই কৃষ্টির সুর
লক্ষ মানিক জ্বালা
বৃষ্টি মানেই ঝরঝরিয়ে
বুকের বর্ণমালা।

ম্লানতা

রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল, শিক্ষক
কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশন (মেইন) বয়েজ

আলতা পরা আলতো পায়ে
তুলসিতলা বেদির পাশে
সন্ধ্যাপ্রদীপ বুক ধড়ফড়
পর্ণের টাকা ছাদ্‌না তলা
দরদস্তুর,
হোক না তবু,
স্বামীর সোহাগ, সেই পুরাতন
বাসর রাতে বেনারসি
গায়ে হলুদ, গন্ধ বেশ।।

দুদিন যেতেই — একলা ঘরে ছ্যাঁক্‌না লোহার
ছুতোয়-ছাতায় দুচোখ রাঙা
চটুল রোশে বর্বরতায় সমুদ্যত
ধূসর যত স্বপ্ন রঙীন
বাসর-স্মৃতি স্বলাজ ভীতি
ঘামছি শুধু যম খাটুনি
কলুর ঘানি কায়ঃক্লেশ।।

কোথায় সেসব শাঁক বাজানো
সন্ধ্যাসকাল আল্‌পনা ময়
নিকানো উঠান রূপকথা সব সুয়োরাণী
দত্তিদানা গানে গানে মনসা ভাসান
আম কুড়ানো বৈশাখী ঝড়
দুপুর রোদে রামায়ণের রম্যগীতি.....।
কেউ কাছে নেই সিঁদুর শাঁখা সঙ্গী শুধু
এককাপড়ে অগোচরে সংগোপনে
নিরুদ্দেশ।।

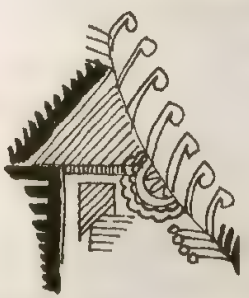

কবির হাতেতে থাকে তবু সোনার কলম

(রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রকে হৃদয়ে ধরে)

নিমাই মান্না, হাওড়া

সময়ের হাত ধরে বহু কিছুই সরে-সরে যায়,
সরে যায় তোমার জন্মভূমি থেকে
বহুদূরে দামোদর নদ,
গড়েরও পরিখা ভরে মানবিক পাললিক মাটিতে।
এখন তো রাজা নেই, নেই রাজ্যপাটও
ধূলিঝড়ে নানা কিছু ওলট-পালট!

মানুষের মাঝে থাকে তবু
কিছু কিছু চিরায়ত বোধ, —
মানুষের ভালবাসা সোনার ফসল
হীরক দ্যুতিতে ছড়ায় নবতর তারই উদ্ভাস।
মানুষের ঘর-দোর, সমাজ-সংসার।
মানুষের চির পরম্পরা
নবোদিত সূর্যলোকে প্রতিদিনই
বর্ণময় আলোকিত হয়।
আকাশ-বাতাস-বৃষ্টি-দিকচক্ররেখা
দাঁড়িয়ে থাকে বাহু মেলে নিজ এলাকায়।

সময়ের হাত ধরে বহু কিছু সরে-সরে যায়,
বদলে যায় রং-রেখা, কিছু-কিছু মুখেরও আদল,
ধূলিঝড়ে নানা কিছু ওলট-পালট!

এখন তো রাজা নেই, নেই রাজ্যপাটও
রাজকণ্ঠের মণিমালা তবু দোলে কবির গলায়;
কবির হাতেতে থাকে তবু ঝক্‌ঝকে সোনার কলম।

প্রেম সাম্যে বেঁধে নিতে ঘর

(প্রিয় 'মে-দিন'কে স্মরণে রেখে)

বলরাম চক্রবর্তী, হাওড়া

'মে-দিন' এসেছে আজ রক্তিম পলাশে ;
রৌদ্রিল আকাশে
ওড়ে রক্ত-নিশান ;
জীবনের গান
শুনে খুঁজে পায় মুক্তি ঠিকানা,
দিগন্ত সীমানা
ছিঁড়ে উড়ে চলে মহাকাশ প্রান্তরে
নিশান্তের ভোরে
মুক্ত-পক্ষ বিহগেরা আবির-আলোকে।
দুঃখ শোকে
ভুলে যায় জীবন-যন্ত্রণা ;
শোষণ-বঞ্চনা
দ'লে শুধে দিতে শহিদের ঋণ
এ-প্রিয় 'মে-দিন'
শপথের বার্তা আনে
সর্ব-হারা কানে।
এসো বন্ধু, জোট বাঁধি এ শতকে
জটিল-জীবন বাঁকে
প্রেম সাম্যে বেঁধে নিতে ঘর
আগ্রাসী মহাজনের সমাধি-উপর।

কুম্ভোকণম ঃ সেই দিনগুলি, রাতগুলি

অশোক অধিকারী, হাওড়া

এখনও অনেক রাত সেইসব কচিমুখগুলো চিৎকারে বলে
যাবে ঃ পড়া নয়, বাঁচতে চাই, পাঠ্যবই নয়, হাসপাতাল দাও
মৃত্যু নয়, ফায়ার ব্রিগেড দাও। ঘন্টা বাজিয়ে দৌড়ে আসুক
লক্ষ লক্ষ গ্যালন জল, ব্যাণ্ডেজ, বার্নল, মারকিওকম্

ঐদিকে পড়েই রইল মা'র তৈরি টিফিন, সিঁড়িতে গড়াগড়ি জলের বোতল
জ্যামিতি বক্সে স্টিকার, রাখীর সুতুলি, চন্দনের ফোঁটা, শুকনো বেলপাতা
এখনও পায়ের নিচে সুড়সুড়ি দিয়ে ঘুম ভাঙায় মা, পিঁচুটি পড়া চোখে
মায়ের চুমুর শব্দ, ছুটির ঘন্টা, ব্যাগবন্দী দৌড়ে যাওয়া জতুগৃহে
আমি পুড়ে যাচ্ছি মা ; তুমি শক্ত করে চেপে ধর এই শরীর
আমার স্বপ্ন আর তালাবন্ধ ভবিষ্যতের এই অপমৃত্যু দিয়ে
আর কত মৃত্যুপুরী হবে আমাদের বিদ্যালয়গুলি
আর কত ক্লোজ সার্কিট টিভিতে ফ্ল্যাশগানে ঝলসে উঠবে
এই পুড়ে যাওয়া শরীর ঃ নগ্ন-দগ্ধ-অর্ধদগ্ধ কবি কিশলয়

শুনেছি মৃত্যুর আগে তোমরা নিচেই নামতে চেয়েছিলে, আমরাতো
ওপরেই উঠতে চাই সাফল্য, প্রতিপত্তি টানটান করা থাকে ওপরে
তোমরা বাঁচার জন্যে নিচেই নামতে চেয়েছিলে ঃ তখনও হু হু
আগুনের শব্দে গিলে খাওয়া মাংস, মজ্জা শুধু পুড়ছে
বাতাসে মানুষগাছ পুড়ে যাবার গন্ধ, আকাশে আশ্চর্যপ্রদীপ
লক্ষতারার নিভে যাওয়া। এই প্রথম একইসঙ্গে চিতায় উঠল
শিশুশিক্ষা, এই প্রথম ৯০টি স্থলপদ্ম-জলপদ্ম স্মৃতিসৌধে
গোলাপ হয়ে ফুটল ঃ বলে গেল শোকস্তব্ধ কবির কাব্যে
'আবার আসিব ফিরে। এই বাঙলায়।.....'

এইসব কুৎসিত দৃশ্য নিয়ে হয়তবা সিনেমা হবে আগামীদিনে
খণ্ড খণ্ড ক্লিপিংস দিয়ে 'জেনেসিস' স্বপ্নসাম্পান, গবেষক
তুলে নেবে স্থির পাতায় ঃ এই ভারী জগদ্দল শোকের বহর
কোল ছাড়া মায়ের চোখে কিভাবে বোলাবে তুলসীপাতা
"এখন আমি তোমার কোলে বসে/পড়ব শুধু পড়া পড়া খেলা"
এখন স্বপ্ন দূরে, পুড়ে যায় লালকমল-নীলকমল, শুধু মৃতের মেলা।

সমিতি সংবাদ

এ্যাসোসিয়েট মেম্বার্স ইউনিটের তৃতীয় ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির এ্যাসোসিয়েট মেম্বার্স ইউনিটের তৃতীয় ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন গত ৮ই আগস্ট সমিতি ভবনে সূর্য-লাঞ্ছিত পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা উত্তোলন করেন ইউনিটের সভাপতি অশোক গাঙ্গুলী। এরপর শহীদ বেদীতে মাল্যদান পর্ব চলে। মাল্যদান করেন ইউনিটের সভাপতি, বিদায়ী সম্পাদক, সমিতির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শ্রীমতী মিত্রা ভট্টাচার্য্য, 'শিক্ষা ও সাহিত্য'-এর সম্পাদক প্রশান্ত ধর ও উপস্থিত প্রতিনিধিগণ।

এরপর বিদায়ী সম্পাদক সম্পাদকীয় প্রতিবেদন সম্মেলনে উপস্থাপিত করেন। এর উপর প্রতিনিধিরা গঠনমূলক আলোচনা করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে সমিতির সভাপতি শ্রীমতী ক্ষমা ভট্টাচার্য্য, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শ্রীমতী মিত্রা ভট্টাচার্য্য, পত্রিকা সম্পাদক প্রশান্ত ধর সম্মেলনে সমিতির সদস্যদের কী করণীয় তা প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরেন। এই ভয়াবহ বিপদের দিনে আগামীদিনে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানান বক্তারা। সাধারণ সম্পাদক অমল ব্যানার্জী তাঁর অনুপস্থিতির কারণ জানিয়ে যে পত্র দেন তা সম্মেলনে পঠিত হয়।

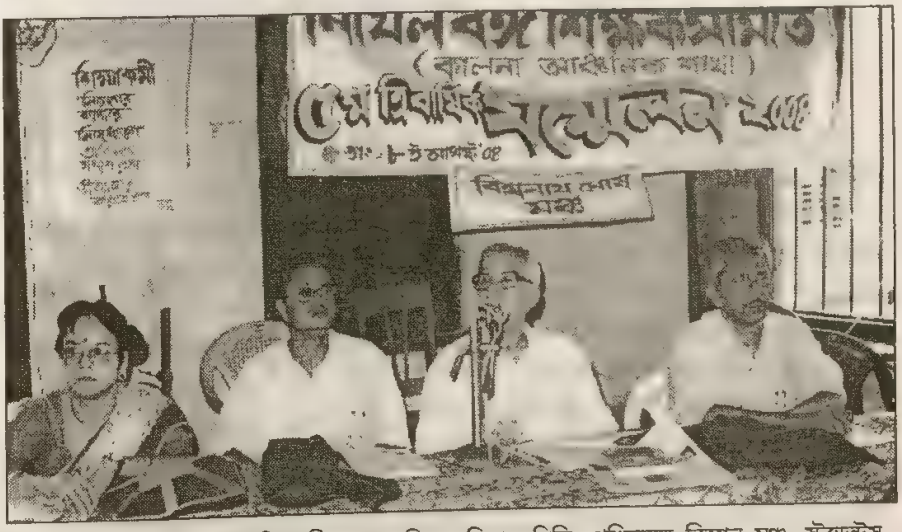

সম্মেলন থেকে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, কর্মকর্তা সহ কোচবিহারে অনুষ্ঠিতব্য রাজ্য সম্মেলনের জন্য একজন প্রতিনিধি সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন।

নবনির্বাচিত কর্মকর্তাগণ

সভাপতি ঃ অশোক গাঙ্গুলী
সম্পাদক ঃ পরাণ পাল
কোষাধ্যক্ষ ঃ হিমাংশু বেরা
রাজ্য সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি ঃ সঞ্জয় গুপ্ত।

বর্ধমান

কালনা আঞ্চলিক শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

গত ৮ই আগস্ট কালনা অম্বিকা মহিষমর্দিনী উচ্চবিদ্যালয়ে কালনা আঞ্চলিক শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টায় সমিতির পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সম্মেলনের সূচনা হয়। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে জেলা নেতৃত্বের পক্ষে উদ্বোধনী ভাষণ দেন রথীন চক্রবর্তী। এছাড়া সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক মহঃ ইউনুস, মহকুমা সম্পাদক সঞ্জিত ব্যানার্জী। বিভিন্ন গণ-সংগঠনের পক্ষে যথাক্রমে নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, ১২ই জুলাই কমিটি ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, স্টুডেন্টস্ হেল্‌থ হোমের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং পৌরপতি গৌরাঙ্গ গোস্বামী আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনে অঞ্চলের ৪৫টি বিদ্যালয়ের ২৬৭জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের ওপর ১২জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। প্রত্যেক বক্তাই গঠনমূলক আলোচনা করেন। আলোচনায় বিদ্যালয়গুচ্ছের কর্মসূচি কার্যকরী, examiner's 'guideline বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে প্রচার করা, জোনালভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সংগঠিত করার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলা এবং বিশেষ করে ১৯৮৪ সালের সিলেবাস পরিবর্তিত হবার আগের অংশ থেকেও ব্যাকরণের প্রশ্ন থাকছে ও টেস্ট পেপার সহায়ক পাঠে যে

ধরনের প্রশ্ন কোথাও কোথাও থাকে, ছাত্রস্বার্থে বিষয়টির সংশোধন করা উচিৎ বলে অভিমত জানান।

প্রতিনিধিরা সাংগঠনিক প্রশ্নেও আলোকপাত করেন। গত লোকসভা নির্বাচনে বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রার্থীদের জয় সুনিশ্চিত করতে সুলতানপুর টি ডি বিদ্যামন্দির ইউনিটের উদ্যোগে আকর্ষণীয় ও দৃষ্টান্তযোগ্য কর্মসূচির কথা উল্লেখ করেন।

সম্মেলনে মোট তিনটি প্রস্তাব সহ সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। গৃহীত হয় পরবর্তী কার্যকরী কমিটির নামের তালিকা, মহকুমা সম্মেলনের প্রতিনিধিদের নাম সহ হিসাব পরীক্ষকের নাম। বিকেল ৫·১৫ মিনিটে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

বাঁকুড়া

ওণ্ডা (পশ্চিম) আঞ্চলিক শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে চিঙ্গানী উচ্চ বিদ্যালয়ে গত ১১ই জুলাই, ২০০৪ ওণ্ডা (পশ্চিম) আঞ্চলিক শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রিয় সমিতির পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের পর সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশানুসারে অত্যন্ত কম সময়ে অথচ দৃপ্ত ও জোরালো বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য পরিমল সিংহ। সভাপতিমণ্ডলী গঠন ও শোক প্রস্তাবের পর বিদায়ী সম্পাদক অসিত চক্রবর্তী যে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন, কোষাধ্যক্ষ জ্যোৎস্না চক্রবর্তী যে আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন জোনের অন্তর্গত প্রতিটি বিদ্যালয়ের উপস্থিত প্রতিনিধিগণের মধ্যে ১৫ জন সদস্য তার উপর আলোচনা করেন। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের মধ্যে অনিল ব্যানার্জী আলোচনা করেন। এবারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল দাবীদাওয়া অপেক্ষা শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়েই বিশেষ প্রাধান্য পায়। বিশেষত মানোন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়ে চিঙ্গানী হাইস্কুলের তরুণ সদস্য রাণা ভট্টাচার্য্য, পুনিশোল হাইস্কুলের তরুণ সদস্য স্বর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য প্রশংসিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ বৎসর মাধ্যমিক পরীক্ষায় চিঙ্গানী হাইস্কুলের সমস্ত পরীক্ষার্থীই কৃতকার্য্য হয়।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাব, জোনাল কমিটির সদস্য নির্বাচন ও মহকুমা সম্মেলনের প্রতিনিধি নির্বাচন সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে সুভাষ দত্ত সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

পরে ২৪শে জুলাই, ২০০৪ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়।

নবনির্বাচিত কর্মকর্তাগণ

সভাপতি ঃ প্রকাশ সামন্ত

সহ-সভাপতি ঃ জ্যোৎস্না চক্রবর্তী, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, পার্থ প্রামাণিক

সম্পাদক ঃ তাপসকুমার ঘোষ

সহ-সম্পাদক ঃ সমীরকুমার বিশ্বাস, অরুণ দে, অমিত ঘোষ

কোষাধ্যক্ষ ঃ সুশান্ত গাঙ্গুলী।

বাঁকুড়া-১নং গ্রামীণ আঞ্চলিক শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

বাঁকুড়া-১নং গ্রামীণ আঞ্চলিক শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন গত ১১ই জুলাই, ২০০৪ জগদল্লা গোড়াবাড়ী এম জি এস বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। আঞ্চলিক শাখার সভাপতি সুধাংশু ধবল পতাকা উত্তোলন করেন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন। শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন সমিতির জেলা সম্পাদক মুক্তিপ্রসন্ন দুবে, আঞ্চলিক শাখার সহ-সভাপতি স্বর্ণেন্দু দাস পট্টনায়েক, বাঁকুড়া-২নং গ্রামীণ জোনের সম্পাদক সঞ্জীব মণ্ডল, স্থানীয় নেতৃত্ব সুভাষ চৌধুরী, কল্যাণ চৌধুরী, রবিলোচন শীট, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকবন্ধুগণ, প্রতিটি বিদ্যালয়ের শাখা সম্পাদকগণ, এম জি এস বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে এম জি এস বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। শোক প্রস্তাব পাঠ করেন আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক প্রদ্যোৎ নারায়ণ সেনগুপ্ত। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিহত শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীদের বরণ করে সংবর্ধনা দেওয়া হয়, সম্মেলন উদ্বোধন করেন জেলা সম্পাদক মুক্তিপ্রসন্ন দুবে। তিনি তাঁর বক্তব্যে বর্তমান পরিস্থিতি, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির গুরুত্ব উল্লেখ করে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করেন। শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকীকরণ ও বাণিজ্যকীকরণের বিরুদ্ধে সমিতির কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকার জন্য শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্যবন্ধুদের আহ্বান জানান। শিক্ষা-সংস্কৃতির উপর সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন রুখতে সমিতির নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম অব্যাহত রাখার কথা বলেন। বর্তমানে শিক্ষক সমাজের নিকট সবচেয়ে বড় সঙ্কট সাধারণের জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে রক্ষা করা, শিক্ষার অঙ্গনকে অটুট রাখা, এন ডি এ সরকারের ইতিহাসকে বিকৃত করা, তামিলনাড়ুতে কর্মচারী-শিক্ষকদের উপর অন্যায় ছাঁটাই, নিপীড়ন, গুজরাটের গোধরাকাণ্ড ইত্যাদি উল্লেখ করেন। ১২ই জুলাই কমিটি ও এস টি এফ আই-এর সভায় বেশি বেশি করে যোগদানের আহ্বান জানান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীবন্ধু সকলকে বিদ্যালয় পরিবেশকে শিক্ষার উপযোগী করে সাধারণের কাছে প্রতিটি ঘরে ঘরে শিক্ষাকে পৌঁছে দেবার আবেদন জানান।

সম্মেলনে ৬৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী সদস্যবন্ধু উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক। প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন ১১ জন সদস্যবন্ধু। এরপর আগামী ৩ বছরের জন্য আঞ্চলিক কমিটির সদস্য নির্বাচিত করা হয় এবং মহকুমা সম্মেলনের প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন আয়-ব্যয়ের হিসাব, আঞ্চলিক কমিটির সদস্য ও মহকুমা সম্মেলনের প্রতিনিধি নির্বাচন সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

সভার শেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ করেন।

মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর আঞ্চলিক শাখার পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

গত ২৫শে জুলাই, ২০০৪ নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির বহরমপুর আঞ্চলিক শাখার পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো স্থানীয় সৈদাবাদ মণীন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাপীঠে। ইতিপূর্বে অঞ্চল শাখার ৫২টি বিদ্যালয় ইউনিট শাখার সম্মেলন শেষ হয়েছে। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে বিগত কয়েকদিন ধরে স্থানীয় বিদ্যালয়গুলিতে উৎসাহ ছিল তুঙ্গে। প্রয়াত দুই প্রাক্তন জেলা সম্পাদক গৌরীচরণ ভট্টাচার্য্য ও সুধীন সেনের নামে যথাক্রমে গৌরীচরণ ভট্টাচার্য্য নগর ও সুধীন সেন মঞ্চ ছিল ব্যানার, পোষ্টার, চিত্রাবলী ও আলোকসজ্জায় সুসজ্জিত। প্রবেশ তোরণ উৎসর্গ করা হয় শিক্ষক আন্দোলনের দুই শহীদ রেজুয়ান হোসেন ও লালমোহন মণ্ডল স্মরণে। সকাল ৮-১৫ মিনিটে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। অঞ্চল কমিটির সভাপতি শ্রীমতী অনুজিতা হোমচৌধুরী পতাকা উত্তোলন করেন। শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও নীরবতা পালনের পর মূল মঞ্চে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। শ্রীমতী অনুজিতা হোমচৌধুরী, অলকনাথ মজুমদার, জ্ঞানবিকাশ মণ্ডল ও অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে গঠিত হয় সভাপতিমণ্ডলী। প্রথমে সম্পাদক অমরেন্দ্র ঘোষাল খসড়া প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব উত্থাপন করেন। আন্তর্জাতিক, দেশীয় পরিস্থিতি, বহরমপুর অঞ্চল শাখার বিগত বছরের কার্যাবলী, সংগঠনের সাফল্য, দুর্বলতা ও বিভিন্ন দাবিদাওয়া সংবলিত খসড়া প্রতিবেদন পেশ করে তিনি সদস্যদের গঠনমূলক আলোচনার জন্য আহ্বান জানান। সম্মেলনের উদ্বোধন করে জেলা সম্পাদক দিলীপ সরকার বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষক সমাজের কি ভূমিকা হওয়া উচিত, সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কোন্ পরিস্থিতিতে বিদ্যালয়ে ছুটির কাঠামোর পরিবর্তন করা হয়েছে এবং জটিল অর্থনৈতিক চাপের মুখে দাড়িয়েও কিভাবে রাজ্য সরকার শিক্ষক সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা রক্ষা করছেন, তাঁর এই আলোচনা উপস্থিত সকলকেই আকৃষ্ট করেছে। এছাড়া সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন এ বি পি টি এ-র জেলা সম্পাদক বিধান ব্যানার্জী এবং অঞ্চল শাখার প্রবীণতম সদস্য সুনীতি বিশ্বাস। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা শ্যাম দে তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শিক্ষক সমাজের অধিকতর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ও পূর্বের এন ডি এ সরকারের জনবিরোধী অর্থনীতির কথা উল্লেখ করে সকলকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন। ৫২টি বিদ্যালয়ের ৪৫২জন সদস্য প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত হন এবং ২৭ জন আলোচনায় অংশগ্রহণ করে প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধকরণের বিষয়ে কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেন। সম্মেলন মঞ্চ থেকে ১) গঙ্গা-পদ্মার ভাঙনরোধে প্রস্তাব, ২) শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকীকরণের বিরুদ্ধে প্রস্তাব, ৩) 'সর্বশিক্ষা'র পক্ষে গৃহীত প্রস্তাব, ৪) তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকা ২রা আগস্ট বাংলা বন্ধ ব্যর্থ করার পক্ষে প্রস্তাব — এই ৪টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্পাদকের জবাবী ভাষণের পর খসড়া প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সম্মেলন মঞ্চ থেকে আগামী ৩ বছরের জন্য শক্তিশালী অঞ্চল কমিটি গঠিত হয়েছে। সভাপতির ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যদিয়ে বিকাল ৫টায় সম্মেলনের কাজ শেষ হয়।

বহরমপুর আঞ্চলিক শাখার অভিমুখীকরণ কর্মশালা

গত ১১ই জুলাই বহরমপুর আঞ্চলিক শাখা আয়োজিত এক ইংরেজি অভিমুখীকরণ কর্মশালা জেলার এ বি টি এ হলে অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালায় ২৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন। অষ্টম শ্রেণির ইংরেজি পঠন-পাঠনের মৌলিক দিক ছিল আলোচনার বিষয়।

সমগ্র আলোচনা পরিচালনা করেন রাষ্ট্রপতি-সম্মানিত জাতীয় শিক্ষক স্বপনকুমার ভাদুড়ী, যিনি ব্রিটিশ কাউন্সিল ট্রেনিংপ্রাপ্ত ও পর্যদের রিসোর্স পার্সন।

ইংরেজি পঠন-পাঠনের জন্য কী কী বিষয়ের উপর শ্রেণিকক্ষে গুরুত্ব আরোপ করা দরকার তা মাননীয় জাতীয় শিক্ষক সবিস্তারে আলোচনা করেন। তিনি বার বার যে কথাটির উল্লেখ করেন তা হলো শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক শিক্ষা। কীভাবে শিক্ষার্থীর মধ্যে সুপ্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যায়, কীভাবে অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থীদ্বারা পূর্ণ শ্রেণিকক্ষকে পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়োজিত করা যায়, দ্বিতীয় ভাষার শিক্ষকের শ্রেণিকক্ষে ভূমিকা, প্রো-এ্যাকটিভ টাস্ক তৈরী করার গুরুত্ব, প্রপোজিশনাল নলেজ ও প্রসিডিওরাল নলেজের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি নিয়ে সম্মানীয় জাতীয় শিক্ষক মনোজ্ঞ ও উদ্দীপক আলোচনা করেন।

তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ ও তত্ত্বসমৃদ্ধ আলোচনা প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে প্রভাবিত করে এবং তাঁরা এইরূপ কর্মশালার পুনঃপুনঃ আয়োজনের দাবী তোলেন। ৪.৪৫ মিনিটে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করার পরও তাঁদের আগ্রহ হ্রাস পায়নি; অনেকে আলোচনার ছেদ টানতে নারাজ। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এইরূপ আগ্রহ গুণমানযুক্ত শিক্ষার ইঙ্গিত বহন করে।

পশ্চিম মেদিনীপুর

১৮ই জুলাই অনুষ্ঠিত গোপীবল্লভপুর-১ আঞ্চলিক শাখার ৫ম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে শিক্ষক নেতা শহীদ অর্ধেন্দু শতপথী স্মরণে গৃহীত শোকপ্রস্তাব

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, গোপীবল্লভপুর-১ আঞ্চলিক শাখার সভাপতি সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষক নেতা কমরেড অর্ধেন্দু শতপথী পরাধীন ভারতে ১৯৪৫ সালের ১২ই জানুয়ারী অবিভক্ত গোপীবল্লভপুর (অধুনা বেলেবেড়া) থানার কুশমাড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতার অশেষ আশীর্বাদে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বেলেবেড়া কে সি এম হাইস্কুল থেকে পাঠ শেষ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন। এরপর বি টি পাশ করার পর বাবুডুমরো হাইস্কুলে সহ-শিক্ষক পদে যোগ দিয়ে আজীবন সেখানে থেকে যান। এরাজ্যে ১৯৭২-'৭৭ আধা-ফ্যাসিস্ট শাসনকালে তৎকালীন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অন্যায় ও বেআইনীভাবে তাঁকে শিক্ষকপদ থেকে কর্মচ্যুত করা হয়। বিদ্যালয় ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত থেকে অদম্য উৎসাহে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন। ঐ সময় ছয়ের দশকের উত্তাল ছাত্র আন্দোলন ও খাদ্য আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করার সময় থেকে কৃষক ও শিক্ষক আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং সর্বোপরি অবিভক্ত গোপীবল্লভপুর থানা ছাড়াও ঝাড়গ্রাম মহকুমার অন্যান্য এলাকায় বামপন্থী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে শুরু করেন। কম্যুনিস্ট ভাবাদর্শে দীক্ষিত কমরেড অর্ধেন্দুদা আজীবন তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করে বীর সৈনিকের ন্যায় শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। রেখে গেলেন স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ আত্মীয়-পরিজন ও অগণিত ছাত্রছাত্রী, শুভানুধ্যায়ী ও সহযোদ্ধাদের সশ্রদ্ধ চিত্তে, শোকাহত হয়ে, অশ্রুসজল নয়নে, বাক্‌রুদ্ধ কণ্ঠে তাঁর অবদান স্মরণ করছি।

স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী সবার প্রিয় অর্ধেন্দুদা ছিলেন ছাত্রপ্রাণ শিক্ষক, স্নেহবৎসল অভিভাবক, মিষ্টভাষী সুবক্তা কুসংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী, সমাজসেবী ও প্রকৃতপক্ষে এক আদর্শবান মানুষ। তাঁর অতিব্যস্ত নিরলস জীবনে জ্ঞানের চাহিদা ছিল অপরিসীম। আবালবৃদ্ধবণিতা সহ সকলের কাছে তিনি ছিলেন আপন। তাঁর প্রয়াণে গোপীবল্লভপুর থানা এলাকার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীসহ সর্বস্তরের মানুষ স্বজন-হারানো নির্বাক কান্নায় স্তব্ধ গোপীবল্লভপুরের ইতিহাসে এই অমর শহীদের আত্মত্যাগ ও আদর্শের দৃষ্টান্ত উত্তরসূরীদের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিতে হবে বর্তমান প্রজন্মকে। বিনম্রভাবে এ সঙ্কল্প গ্রহণ করছি আমরা।

তাঁর অনুকরণীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নতুন সমাজ গড়ার কারিগর হিসাবে সে গুরুদায়িত্ব পালন করতে পারলেই তাঁর অমর স্মৃতির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে।

তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন ও নিকট আত্মীয়দের পাশে থেকে আমরা সকলে দুঃখ ভাগ করে নেব — এই অঙ্গীকার করছি।

বীরভূম

জেলাশাখা আয়োজিত সভা

গত ১১ই জুলাই সকাল ৯টায় সমিতির জেলা শাখার নেতৃত্বে জুনিয়র হাইস্কুল সাব কমিটির সভা সত্যপ্রিয় ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীমতী আরতি রায়।

এই সভায় আগত সদস্যবৃন্দ জুনিয়র হাইস্কুল সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা ও দাবীর উপর আলোচনা করেন।

পেশাগত দাবী-দাওয়া ও শিক্ষার উন্নয়নে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির লড়াই-আন্দোলনের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে স্মরণ করেন উপস্থিত সদস্যগণ।

ঐ একই দিনে বেলা ১২টায় সমিতির মহিলা সাব-কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখা-সদস্যা লাইলুন নেহার বেগম।

উক্ত সভায় মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে সমস্যা, পেশাগত বিভিন্ন দাবী, বন্ধু সরকারের আমলে মহিলাদের গুরুত্ব বৃদ্ধির কথা, নারী দিবস উদ্‌যাপনের গুরুত্ব প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সংগ্রামী ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনা করেন।

সমিতির জেলা সহ-সম্পাদিকা মায়া সাধু (দত্ত) নারীদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে লড়াইয়ে সমিতির নিরলস প্রচেষ্টার কথা বিস্তৃত আলোচনা করেন।

এইদিন বেলা ২টায় সমিতির অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষা-কর্মীদের সাব-কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা নেতৃত্ব আব্দুর রহিম। সভায় উপস্থিত সদস্যগণ সমিতির অতীতের সংগ্রামী ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরেন।

সভায় সমিতির জেলা সম্পাদক রবিউল হক সমিতির লড়াই আন্দোলনে বীরভূম জেলার প্রবীণ সদস্য-সদস্যাদের ভূমিকা স্মরণ করে ইতিহাস রচনার আহ্বান জানান।

জেলা শাখা আয়োজিত শিক্ষাকর্মী সভা

গত ১৮ই জুলাই (রবিবার) সমিতির বীরভূম জেলা শাখার নেতৃত্বে কর্মকেন্দ্র সত্যপ্রিয় ভবনে সকাল ৯টায় শিক্ষাকর্মী সাব-কমিটির বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন অনিমা রায়।

উক্ত সভায় শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের পেশাগত বিভিন্ন সমস্যা ও দাবীদাওয়া নিয়ে সমিতির সদস্যরা তাদের বক্তব্য পেশ করেন।

শেষে শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও দাবীদাওয়া সম্পর্কে সমিতির নিরলস আন্দোলন, সংগ্রাম ও সাফল্যকে তুলে ধরেন সমিতির জেলা শাখার সহ-সম্পাদক বেনজির রহমান।

এইদিন বেলা ১২টায় মাদ্রাসা সাব-কমিটির সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ আব্দুস সাত্তার ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ অধ্যাপক সুদিন চট্টোপাধ্যায়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির বীরভূম জেলা শাখার সভাপতি হরপ্রসাদ চ্যাটার্জী।

সভায় শুরুতে সমিতির জেলা সম্পাদক রবিউল হক বিশেষ অতিথি শ্রদ্ধেয় সুদিন চট্টোপাধ্যায়ের হাতে একটি পুষ্পস্তবক, উত্তরীয়, রবীন্দ্র প্রতিকৃতি ও বীরভূমের শিল্পী কর্তৃক নির্মিত একটি ব্যাগ স্মারক হিসেবে তুলে দেন। ঐ একই স্মারক প্রধান অতিথি শ্রদ্ধেয় ডঃ সাত্তারের হাতে তুলে দেন জেলা শাখার সহ-সভাপতি অনিমা রায়।

আলোচনা সভার শুরুতে জেলা সম্পাদক রবিউল হক মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প, সমিতির ভূমিকা ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

এরপর শিক্ষাবিদ্ শ্রদ্ধেয় চট্টোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার বেসরকারীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণে বিগত কেন্দ্রীয় সরকারের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সমিতির ঐকান্তিক লড়াই-সংগ্রামকে তুলে ধরেন ও এই ব্যাপারে শিক্ষক সমাজের দায়িত্বের কথা জোর দিয়ে বলেন।

প্রধান অতিথি শ্রদ্ধেয় ডঃ আব্দুস সাত্তার তাঁর বক্তব্যে প্রাঞ্জল ভাষায় মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ, মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকসমূহের সহজলভ্যতা, মাদ্রাসা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের পেশাগত সমস্যার সমাধানে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাহায্য ও সমর্থনের কথা তুলে ধরেন।

সভায় উপস্থিত মাদ্রাসা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে ডঃ সাত্তার সাহেবের মুখোমুখি প্রশ্নোত্তর পর্বটি মনোজ্ঞ হয়ে উঠে।

এদিনের সভায় উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

শোক

বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনাবসান

গত ৩০শে জুলাই আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন ঈর্ষণীয় কণ্ঠমাধুর্যের অধিকারিণী সঙ্গীতশিল্পী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। প্রতিমা দেবীর জন্ম টালিগঞ্জ রোডে মামার বাড়িতে। ১৯৩৩ সালের ২১শে ডিসেম্বর। প্রথম সঙ্গীত শিক্ষা মা কমলা দেবীর কাছে। তারপর গান শিখেছেন তিন দিক্‌পাল প্রকাশকালী ঘোষাল, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। প্রথম রেকর্ড বেরোয় ১৩ বছর বয়সে। অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তাঁর গাওয়া 'একটা গান লিখ আমার জন্য' গানটি। ১৯৪৭-এ প্রথম প্লেব্যাক 'সুনন্দার বিয়ে' ছবিতে। 'শাপমোচন' ছবিতে 'ত্রিবেণী তীর্থপথে' গানটি তাঁর অসাধারণ উচ্চাঙ্গসঙ্গীত সাধনার পরিচয় বহন করে। ন'শোর বেশী গান গেয়েছেন। গানের রেকর্ডের সংখ্যা তিনশোর বেশি। প্রতিমা দেবী দীর্ঘদিন ধরে আর্থারাইটিসে কষ্ট পেয়েছেন। অননুকরণীয় ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর। গানে ভুবন ভরিয়ে দিয়ে চিরতরে চলে গেলেন প্রতিমা দেবী। সঙ্গীত রসিকের অন্তরে পাতা রইল তাঁর চিরস্থায়ী আসন।

সমিতি এই শিল্পীর মৃত্যুতে শোকাহত চিত্তে সমবেদনা জানাচ্ছে তাঁর পুত্র-কন্যা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের।

●

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বাসন্তী সেন্ট টেরিজা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা গোপা মহাকুড় (মহান্তী) গত ১৮ই জুলাই দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে সমিতি শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

●

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত পুণ্ডীগ্রাম ডি সি এস বিদ্যাপীঠের সহ-শিক্ষক মহঃ আবু বাক্কার দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগাক্রান্ত হয়ে কর্মরত অবস্থায় ৫৭ বৎসর বয়সে প্রয়াত হন। তিনি দীর্ঘদিন সমিতির একজন একনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তাঁর মৃত্যুতে সমিতি গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে

নিন্দা, ধিক্কার

ইঙ্গ-মার্কিন দস্যুরা ইরাকে হত্যা করেছে ২৫০ শিক্ষককে

'সিটিজেন্স অ্যাগেইনস্ট এয়ার অ্যাণ্ড অকুপেশন' সম্প্রতি এক বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে যে মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনীর আক্রমণে গত বছর কমপক্ষে ৩০ হাজার ইরাকী সেনার মৃত্যু হয়েছে। কমপক্ষে ৮ হাজার নাগরিক ঐ আক্রমণে নিহত হয়েছেন। কুড়ি হাজারেরও বেশী মানুষ জখম হয়েছেন। এই হত্যালীলায় শিক্ষকরাও বাদ যান নি। ইরাকী বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির সংগঠন জানিয়েছে, ২০০৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে এ পর্যন্ত ইরাকের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫০ শিক্ষককে হত্যা করা হয়েছে।

সমিতি এই বর্বরোচিত শিক্ষক হত্যার তীব্র নিন্দা করছে ও ধিক্কার জানাচ্ছে মানবতার শত্রুদের বিরুদ্ধে।

ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইরাক থেকে হাত উঠাও।

গ্রন্থবিলোকন

কম্পিউটারের যুগে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক গণিত চর্চায় নতুন ভাবনা

শিশিররঞ্জন চক্রবর্তী

দাম ১৫ টাকা

সমালোচক ব্যক্তিজীবনে লেখকের কাছে বয়সে অনুজ এবং সম্পর্কে শিষ্যস্থানীয় হলে সমালোচনায় এর ছায়াপাত এড়িয়ে চলা দুরূহ। কিন্তু আলোচ্যমান ছেচল্লিশ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থিকাটি সে দ্বিধা কাটিয়ে দিল। শিক্ষকের নয়, নিছক বোবা বইটার কানমলা সমালোচনাকে স্তুতির দিকে টেনে নিয়েছে। বইয়ের মধ্যেই ফুটে উঠেছে লেখকের ব্যক্তি পরিচিতি। জ্ঞানের সুদীর্ঘ চর্চা-সঞ্জাত গভীরতা আর প্রাঞ্জলতা লেখককেই তুলে ধরেছে।

বইটা অঙ্ক স্যারদের জন্যে লেখা হয়েছে ধরে নিলে দারুণ ভ্রান্তির কবলে পড়তে হবে। কম্পিউটার প্রশিক্ষণের কোনো ব্যাপারও নয়। 'নতুন ভাবনা' হল এর প্রসঙ্গ। গণিতবিতৃষ্ণ পাঠকদের — অভিজ্ঞতা বলে অধিকাংশ পাঠকই এই দলে — কাছে সমালোচকের আবেদন, এই ছোট্ট বইটা পড়ে ফেলুন।

বইয়ের বিষয়ের ব্যাখ্যানে যাওয়া যাচ্ছে না স্থানাভাবে। শিরোনাম অনেকটা সাহায্য করবে বুঝে নিতে। অঙ্কশাস্ত্রের চর্চারও একটা শাস্ত্র আছে, যেমন আছে ইতিহাস, ভূগোল এবং অন্যান্য শাস্ত্রের। তারই নমুনা আছে এই বইতে। শিশিরের বিন্দুতে বিশালের পরিচয়। শিশিরের মতোই স্বচ্ছ আর বর্ণোজ্জ্বল।

বেশ কিছুটা আছে আমাদের চেনা বিষয় — স্কুলে অঙ্কের বইতে যেভাবে অঙ্ক এবং তার উদ্দেশ্য শেখানো থাকে তারই আধুনিকতর রূপ, উদাহরণ হিসেবে। উদাহরণের অংশই জুড়ে আছে বইয়ের সিংহভাগ।

গণিতে কেউই জন্ম-অরসিক হয় না। দরকার একটু কৌতূহল তৈরি করে দেওয়া। গণিতবিমুখ পাঠকদের মধ্যে এই কৌতূহল গড়ে তুলতে দারুণ সাহায্য করতে পারবে এ বই, যদি আগেই বিধর্মী ম্লেচ্ছ অতএব বর্জ্য ধরে নেওয়া না হয়।

আদিম বন্যজীবনের দড়িতে-গিঁট-দেওয়া গণিত থেকে কম্পিউটারে উত্তরণের ইতিবৃত্ত খুবই আকর্ষণীয় হয়েছে।

বইতে একটা মৌলিক প্রসঙ্গ লেখক যথার্থই তুলে ধরেছেন। গণিত শিক্ষা বা সামগ্রিকভাবে শিক্ষা ব্যাপারটাকেই সমাজ কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিচারে বসলে কানামাছি ভোঁ ভোঁ অবস্থা অনিবার্য।

ভারতীয় সমাজ গণতান্ত্রিক শিক্ষাধারার অনুকূল কোনো সহস্রাব্দে ছিল না, আজও হতে পারে নি। মধ্যযুগ পুরোপুরি বিদায় না নেওয়া পর্যন্ত গণতন্ত্র দাঁড়াবার জমি পায় না। ব্রিটিশরা চাকর বানাবার কারখানা হিসেবে যে শিক্ষাধারার পত্তন করেছিল এদেশে, স্বাধীনতার পরে স্বদেশীয় প্রভুরা যাকে অটুট রেখে বাইরে থেকে নানা অলঙ্কারে সাজিয়েছে, তা স্বাধীন চিন্তার শিকড় কেটে দেয় শিক্ষার আরম্ভেই। যে শিক্ষাতরুর লক্ষ্য গণতান্ত্রিক মনুষ্যত্ব অর্জন নয়, লক্ষ্য ব্যক্তিগত কেরিয়ার অর্জন, তার কোনো শাখাতেই মনুষ্যত্ব ফল ধরে না, ভালো সার-জল জুটলে ধরে রসালো কেরিয়ার ফল। ভৌতবিজ্ঞানের বা প্রযুক্তি শাস্ত্রের কেরিয়ারের মারকাটারি চাহিদা মেধাবী শিক্ষার্থীকে বাধ্য করে গণিতচর্চায়, যার মেধার বাস্তব অভিমুখ ইতিহাসে বা দর্শনশাস্ত্রে তাকেও। কেরিয়ারের ইঁদুরদৌড় চুলের মুঠি ধরে গণিতচর্চায় নিয়ে না গেলে গণিতবিতৃষ্ণা। এই বিতৃষ্ণা কাটাবার রাস্তা খুঁজতে আমাদের শিক্ষাতরুর মূলের দিকটায় নজর দিতে হবে। আপাতত চলতি অবস্থায় যেটুকু সম্ভব নানান কৌশলে এগিয়ে চলার চেষ্টা চালাতে হবে, যেমন দেখানো হয়েছে এই বইতে।

আরো একটি মৌলিক সমস্যার উল্লেখ লেখক ভূমিকাতেই করেছেন।

ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লবের পর্যায়ে মুনাফার তাগিদে প্রযুক্তি বিস্ফোরণের সূচনা হয়েছিল। তা আজ পর্যন্ত কখনো স্তিমিত হয় নি। বরং এ গতি ত্বরান্বিত। সমানে বিস্ফোরণের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। আজকের সদ্যোজাত শিশু তার যৌবনকালে

প্রযুক্তির কোন্ রূপ দেখবে তা আজ কল্পনাতেও আনা যায় না। যেমন একশো বছর আগে হতো না আজকের রূপ কল্পনায় আনা। 'মাঝে মাঝে বটে ছিঁড়েছিল তার'। এই ক্রমতীব্রায়মান গতিতে পুঁজিব্যবস্থা বারে বারে বেটাল হয়েছে, ভারসাম্য হারিয়েছে। গত শতকের তিরিশের দশকের আরম্ভে তো হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল। ষাটের দশকে আর একটা সংকট বড় আকার নিয়েছিল। 'সুর তবু লেগেছিল বারে-বার'। ইতিহাসের চাহিদায় প্রত্যেকবার আবার উঠে জোরে দৌড় লাগিয়েছে।

ছুটে চলা প্রযুক্তির টানে সমাজব্যবস্থা তাল রেখে চলতে পারে না, তার ফলে পারে না শিক্ষাব্যবস্থাও। এক একটা সংকটের পরে ভারসাম্য রক্ষা করতে শিক্ষাব্যবস্থাকেও সমানে তাপ্পি দিয়ে চলতে হয়।

লেখকের উল্লেখ অনুযায়ী গত শতকের শেষ দিকে শিক্ষা সংকট প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক বিচারে সাব্যস্ত হয়েছিল, শিক্ষা সংকট সামাজিক সংকটেরই বহিঃপ্রকাশ। বাস্তবে ইতিহাসেরই চাহিদায় যখন পুঁজিব্যবস্থাই বাতিল হয়ে যাবে, ততদিন পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক সংকট আর উত্তরণ চলতে থাকবে। শিল্প-প্রযুক্তি থেকে সমাজের চলনে, তা থেকে শিক্ষায়।

পশ্চিম সমাজে এইভাবে কম্পিউটার ক্রমে শিক্ষাক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তার ঢেউ এসে পড়ল এদেশের শিল্প-বাণিজ্য হয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে। এ বইতে তার কিছু পরিচয় দেওয়া আছে। দেওয়া আছে এই অবস্থায় আমরা কোন্ পথে এগিয়ে যেতে পারি তারও নিশানা। কিন্তু যা দেওয়া নেই, দেওয়া আদৌ সম্ভব নয় — এই কম্পিউটারের গুঁতোয় শিক্ষার ধারার আবার কত দিকে কত তাপ্পি অনিবার্য হয়ে পড়বে!

আরো সমস্যা আছে। ওরা ওদের সমাজ কাঠামোয় বসে যে সব পরীক্ষা চালাচ্ছে, আমরা নিচের ধাপের আধা-মধ্যযুগীয় সমাজে তার হুবহু নকল করে কতটা সাফল্য পাব।

এই বইয়ের বিষয়টি নিয়ে দেশে-বিদেশে ফোয়ারার মত বই প্রকাশিত হয়ে চলেছে। কিন্তু এত সংক্ষেপে, বাংলা ভাষায়, আমাদের মতো অপণ্ডিতদের কাছে এত প্রাঞ্জলভাবে বিষয়টিকে তুলে ধরার জন্য লেখকের প্রাপ্য অকুণ্ঠ ধন্যবাদ।

আশা করা যায়, তাড়াতাড়ি এই বইয়ের পুনর্মুদ্রণের দাবি এসে পড়বে। সেই সময়ে আর একবার খুঁটিয়ে প্রুফ দেখলে মুদ্রণকে ত্রুটিহীন করে তোলা যাবে।

সকলের কাছেই সমালোচকের আবেদন, বাংলা ভাষায় লিখলে, বাংলা আকাদেমি সারা বিশ্বে বাংলা ভাষা বিশেষজ্ঞদের স্বীকৃত যে বানান পদ্ধতি চালু করেছেন, তাকে ধরুন। প্রয়াস সাপেক্ষ, কিন্তু আখেরে আমাদের মাতৃভাষা আরো মসৃণ হয়ে উঠবে। এই পুস্তিকায় আংশিক চেষ্টা হয়েছে। পুনমুর্দ্রণের সময়ে বানানের দিকটাও খুঁটিয়ে দেখলে খুব ভালো হবে।

— শুভজ্যোতি সেন

গ্রন্থাবলোকন

দিন বদলের দিশারী

সম্পাদনা : **লক্ষ্মণ কর্মকার**

সৃজন প্রকাশনী

কুশপাতা ❐ ঘাটাল ❐ পশ্চিম মেদিনীপুর

মূল্য : চল্লিশ টাকা ❐ প্রাপ্তিস্থান : পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

'নিউবুক সাপ্লাই' এবং 'আধুনিক' ❐ ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর

শ্রেণিবিভক্ত সমাজের মধ্যে বাস করে কমিউনিস্টরা শোষণহীন উন্নত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করেন। বুর্জোয়া সমাজের সহজাত যে জীবন দর্শন, নীতিহীনতা এবং ক্লেদ-গ্লানিকে ত্যাগ করে কমিউনিস্টরা নতুন জীবন দর্শন ও উন্নত সামাজিক মূল্যবোধ আয়ত্ত করেন। কার্ল মার্কস বলেছিলেন, সমাজকে বদলাতে গেলে নিজেদের বদলাতে

হয়। এটা দু'একদিন বা দু'এক বছরের ব্যাপার নয়। এ লড়াইটা দীর্ঘস্থায়ী এবং কঠিন। এই কঠিন লড়াই যাঁরা করেছেন এবং আদর্শে-ভাবনায়-কর্মধারায় কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনকে ঘাটাল মহকুমায় একটি স্থায়ী ভিত্তি দিয়েছেন, গণ-আন্দোলনকে সম্প্রসারিত করেছেন, এমনই আটজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বের কথা লক্ষ্মণ কর্মকার সম্পাদিত 'দিন বদলের দিশারী' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই আটজন হলেন ঃ স্বদেশরঞ্জন দাস, মোহিনীমোহন মণ্ডল, মৃগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সুকুমার সেনগুপ্ত, ষোড়শী চৌধুরী, নিকুঞ্জ বিহারী চৌধুরী, ডাঃ যতীশ চন্দ্র ঘোষ এবং লক্ষ্মণ দিগর। এঁদের জীবন সংগ্রাম সমাজকে বদলানোর জন্য সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিল। লেখাগুলি পড়তে পড়তে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যাচ্ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি যে আখের গুছানোর পার্টি নয়, মতাদর্শগত দৃঢ়তা অর্জন করতে গেলে একজন কমিউনিস্টকে যে নিয়মিত গভীরভাবে পড়তে হয়, ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে হয়, গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার শরিক হতে হয়, এইসব শিক্ষাই এই আটজনের জীবনী থেকে গ্রহণযোগ্য।

ত্রিশের দশকের প্রথম পর্বে মেদিনীপুর জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন স্বদেশরঞ্জন দাস, মোহিনীমোহন মণ্ডল এবং মৃগেন্দ্র ভট্টাচার্য। পরে আসেন সরোজ রায়, ভূপাল পাণ্ডা। কমরেড সুকুমার সেনগুপ্ত তাঁর ৬০ বছরের রাজনৈতিক জীবনের ২০ বছর কারাগারে ও ১৩ বছর আত্মগোপন করে কাটিয়েছিলেন। অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলা কার্যত সংশোধনবাদীদের ঘাঁটি ছিল। সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই করেছিলেন তিনি। এই লড়াইয়ের মধ্যে দিয়েই এখানে সি পি আই (এম)-কে প্রধান শক্তিতে পরিণত করেন তিনি। কখনো সাইকেলে, কখনো পায়ে হেঁটে ঘাটাল থানা তথা মহকুমায় পার্টি গড়ার কাজে লিপ্ত ছিলেন তিনি। ষোড়শী চৌধুরী সাঁজা বিরোধী আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন ও ভারত ছাড়ো আন্দোলনের মধ্যথেকে সমাজ পরিবর্তনের একজন সেনাপতিতে উন্নীত হয়েছিলেন। ঘাটালের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে নিকুঞ্জবিহারী চৌধুরী একটি বিশিষ্ট নাম—এখনকার প্রধান বামপন্থী কর্মীদের অনেকেরই রাজনীতির হাতে খড়ি তাঁর হাতে। বাংলা-বিহার সংযুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলাতে ডাঃ যতীশ ঘোষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসে চন্দ্রকোণার হতদরিদ্র এবং নিম্নবর্ণের সক্রিয় কৃষক নেতৃত্ব লক্ষ্মণ দিগর শোষিত কৃষকদের সংঘবদ্ধ করে ইস্পাত কঠিন আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। দারিদ্র্যে কখনো তিনি ভেঙে পড়ে আদর্শচ্যুত হন নি। সমগ্র চন্দ্রকোণা লক্ষ্মণ দিগর ও ষোড়শী চৌধুরীর জন্য গর্বিত। এই রকম আরও অনেক মূল্যবান তথ্যে সমৃদ্ধ 'দিন বদলের দিশারী' গ্রন্থটি।

এই নিবেদিতপ্রাণ নেতাদের জীবনকাহিনী লিখেছেন শেখ ইসরাইল, অশোক পাল, রেণুপদ ভট্টাচার্য, জহর সাঁতরা, পঙ্কজ ভট্টাচার্য ও লক্ষ্মণ কর্মকার। লেখকরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে শ্রদ্ধেয় কমিউনিস্ট নেতৃত্বের ব্যক্তিজীবন ও সাংগঠনিক জীবন সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন। উদ্দেশ্য, একটা সমাজ পরিবর্তনের বর্তমানের কর্মীদের অনুপ্রাণিত করা। বিশ্বায়নী সংস্কৃতির প্রতাপ আর বাজার মৌলবাদের দাপাদাপি যখন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে ব্যাহক করছে তখন আত্মত্যাগের উজ্জ্বল নিদর্শন এইসব কমিউনিস্টদের কথা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। আজ বিশ্বে সমাজতন্ত্রের যে কোনো বিকল্প নেই তা নতুন করে অনুভূত হচ্ছে। আজ চাই সমাজতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ অগণিত নিষ্ঠ কর্মী। এই গ্রন্থ তেমন কর্মী তৈরি করতে অবশ্যই সাহায্য করবে।

বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান শ্রদ্ধেয় বিমান বসু এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন।

গ্রন্থটি পাঠে সমাজ পরিবর্তনে আন্তরিক কর্মীরা যে উদ্দীপ্ত হবেন, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। ভণ্ডামো-বর্জিত তিমির বিনাশী হওয়ার স্বপ্ন দেখায় রসদ যোগাবে এ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বর্ণিত বিপ্লবীদের আদর্শের আগুনে ভস্মীভূত হোক লোভ আর ঈর্ষা সিন্ধু-মন্থন সঞ্জাত পচা-গলা 'আমি'-টা — প্রশস্ত হোক, নির্মল হোক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ।

—শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাবলোকন

মাধ্যমিক শিক্ষকদের চাকুরিগত সমস্যা ও সমাধান

পশুপতি ঘোষ

বি এম পাবলিশার্স ❐ মূল্য ঃ তিনশত টাকা

বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের সঠিক বেতন নির্ধারণ, পেনশন ও গ্র্যাচুইটি প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে পশুপতি ঘোষ মহাশয়ের ইতিপূর্বে প্রকাশিত "Hand Book of Pension, Pay Fixation, Leave and GPF Rules, 1995" ও "অবসরের দিনই পেনশন"—এই গ্রন্থদুটি প্রভূত সহায়ক হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারীদের চাকুরিগত সমস্যা সমাধানে প্রতি সপ্তাহে দৈনিক সংবাদপত্রে তাঁর নিরলস প্রশংসনীয় প্রয়াস ইতোমধ্যেই সাড়া ফেলেছে এবং তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে ফলপ্রসূ হয়েছে। এবিষয়ে "মাধ্যমিক শিক্ষকদের চাকুরিগত সমস্যা ও সমাধান তাঁর" নতুন সংযোজন। এই গ্রন্থটির পরিসর ব্যাপক। এই গ্রন্থটি শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মীদের চাকুরিগত সমস্যা সমাধানে ও অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা পেতে বিশেষভাবে সহায়তা করবে। আবার বিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনারও সহায়ক হবে।

চাকুরিজীবনের অবসরান্তে পেনশন, গ্র্যাচুইটি, পারিবারিক পেনশন, চাকুরিরত অবস্থায় মৃত্যুতে বর্ধিত হারে গ্র্যাচুইটি, পেনশনের কমিউনেশন ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ যুক্তফ্রন্ট সরকারের অবদান। এই সকল সুযোগ-সুবিধা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ থেকে আর্থিক নিরাপত্তা এনেছে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের জীবনে।

বেতন নিরূপণ, বিভিন্ন সময়ের সংশোধিত বেতনক্রমে 'অপশন' প্রদান, 'সার্ভিস বুক' সংকলন এবং পেনশন, গ্র্যাচুইটির আবেদনপত্র পূরণ—ইত্যাদি ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকায় পেনশন ও গ্র্যাচুইটি নির্ধারণ ও প্রদানে বিশেষ জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। ইতোপূর্বে প্রকাশিত পশুপতি বাবুর গ্রন্থদুটি এই সকল জটিলতার গ্রন্থি উন্মোচন করতে সহায়ক হয়েছিল।

"Headmaster's Manual"-এ বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য সরকারী নির্দেশনামা (G.O.) ও সার্কুলার থাকে। সরকারী নির্দেশনামার জটিলতা অনেক সময় সহজে বোধগম্য হয় না এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

"মাধ্যমিক শিক্ষকদের চাকুরিগত সমস্যা ও সমাধান" পুস্তকে সরকারী নির্দেশনামা (G.O.) ও সার্কুলার নির্ভুলভাবে মুদ্রিত হয়েছে। অন্যদিকে বিদ্যালয়ের পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের চাকুরিজীবনে যে সমস্যার উদ্ভব হয়, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এই সকল সমস্যার সমাধান সহজ বোধগম্য ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এই গ্রন্থের বিশাল ব্যাপ্তি উপলব্ধির জন্য গ্রন্থে আলোচ্য কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক নিয়মাবলী, বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির নির্বাচন পদ্ধতি, শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীদের নিয়োগ, স্থায়ীকরণ, বরখাস্ত ও সাময়িক বরখাস্তের নিয়মাবলী, বিভিন্ন সংশোধিত বেতনক্রমে বেতন নির্ধারণ, ছুটির নিয়মাবলী, অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা (পেনশন, পারিবারিক পেনশন, স্বেচ্ছায় অবসর পেনশন, গ্র্যাচুইটি, কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলে বর্ধিত গ্র্যাচুইটি, পেনশনের কমিউটেশন, ভবিষ্যনিধি), প্রশিক্ষণের জন্য ডেপুটেশন, এস এস সি'র মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়োগ ইত্যাদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সর্বক্ষেত্রের সমস্যাবলীর সমাধান এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে পশুপতি ঘোষ মহাশয় আলোচ্য বিষয়ে অদ্বিতীয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একাউন্ট্স্ বিভাগে তাঁর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং অবসরের পরে তাঁর মেধা, পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারীদের সমস্যাবলী এবং বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে নিরলসভাবে নিয়োজিত।

এই গ্রন্থের বহুল প্রচার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক সমস্যা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের চাকুরিজীবনের সমস্যা সমাধানে বিশেষভাবে সহায়ক হবে।

—চিত্তরঞ্জন দাস

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি

সত্যপ্রিয় ভবন

পি-১৪, গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলকাতা-৭০০ ০১৩

সমস্ত সদস্যের প্রতি

পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন ও ৭৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা সফল করুন

বন্ধুগণ,

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির গঠনতন্ত্র অনুসারে এবং ২০·৬·২০০৪ তারিখে সমিতির কেন্দ্রীয় পরিষদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ও সমিতির কোচবিহার জেলা শাখার আমন্ত্রণে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন আগামী ১৯, ২০ ও ২১শে নভেম্বর, ২০০৪ তারিখে কোচবিহার শহরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

এই সম্মেলনে শিক্ষা, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, ছাত্র ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যাবলী সহ দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হবে এবং আগামী তিন বছরের জন্য সমিতির কেন্দ্রীয় পরিষদ ও সমিতির অ্যাপিল কমিটি নির্বাচিত হবেন।

সমিতির ২০০৩-২০০৪ সালের সদস্যগণকে সম্মেলনে বিবেচনার জন্য খসড়া প্রস্তাব সম্মেলনের ৪৫ দিন পূর্বে অর্থাৎ ৪ঠা অক্টোবর, ২০০৪ তারিখের মধ্যে সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রত্যেকটি প্রস্তাব পৃথক পৃথকভাবে **সাদা কাগজের এক পিঠে পরিষ্কারভাবে** লিখে পাঠাতে হবে। প্রস্তাবের শেষে প্রস্তাবক ও সমর্থকের নাম, বিদ্যালয়, অঞ্চল, মহকুমা ও জেলার নাম উল্লেখ করতে হবে। এ বিষয়ে সক্রিয় উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করছি।

সমিতির গঠনতন্ত্র অনুসারে জেলা ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি সদস্যগণ সম্মেলনের পূর্বে অভ্যর্থনা কমিটিকে দেয় প্রতিনিধি ফি দিয়ে সমিতির পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত হতে পারবেন। কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যগণ পদাধিকারবলে প্রতিনিধি হবেন। প্রতিনিধি ফি ১০০ (একশত) টাকা।

পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে সমিতির গঠনতন্ত্রের ১১নং বিভাগের ২৩নং এবং ১২নং বিভাগের ২৪নং ধারা অনুসারে আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচিত হবে।

জেলা শাখার পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন শেষ হওয়ার সাত দিনের মধ্যে সমিতির রাজ্য সম্মেলনের জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নামের তালিকা (বিদ্যালয়ের নাম এবং ঠিকানা সহ) সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ পৃথক সার্কুলারে ইতিমধ্যে পাঠানো হয়েছে। যে

সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সম্মেলন হতে চলেছে এবং এই পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় সর্বস্তরে আলোচনার মধ্যে আনতে হবে। পেশাগত অর্জিত অধিকার ও সঙ্গত দাবীর বিষয়ে সমিতির দৃষ্টিভঙ্গী সদস্যদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির ৭৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২১শে নভেম্বর, ২০০৪ তারিখে কোচবিহার শহরে বেলা ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। সমিতির সমস্ত বৈধ সদস্য এই সাধারণ সভায় উপস্থিত হতে পারবেন। বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য ধার্য্য প্রতিনিধি ফি ১০ (দশ) টাকা। অভ্যর্থনা সমিতির কার্যালয়ে জমা দিয়ে তাঁরা এই বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সমিতির গঠনতন্ত্রের সংশোধনের প্রস্তাব সহ বার্ষিক সাধারণ সভার অন্যান্য বিচার্য বিষয়গুলি ৭৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বিবেচিত হবে। নির্দ্ধারিত সময়সুচি অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি ইতিপূর্বে পাঠানো হয়েছে।

রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে মহকুমাস্তর পর্য্যন্ত শিক্ষা সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেমিনার ও কনভেনশন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে সম্মেলন সফল করে তুলতে হবে। সম্মেলনের সাফল্যের আর একটি দিক সামগ্রিক সচেতনতা ও সংগঠনের গতিশীলতা বৃদ্ধি।

অভিনন্দন সহ,

অমল ব্যানার্জী

সাধারণ সম্পাদক

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

২৫শে আগস্ট, ২০০৪

কলকাতা

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

সমিতির পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলনের স্থলে প্রতিনিধিদের কোচবিহার শহরে পৌঁছতে ট্রেন ও বাসের সময় নির্ঘন্ট

এক নজরে

ট্রেন নম্বর	ট্রেনের নাম এবং যে রুট দিয়ে যায়	যে স্টেশন থেকে ছাড়ে	ছাড়ার সময়	কখন এবং কোথায় পৌঁছায়	সপ্তাহে কতদিন এবং কোন্ কোন্ দিন ছাড়ে	বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়
৫৬৫৭ আপ	কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (বর্ধমান হয়ে)	শিয়ালদহ	সকাল ৬-২৫মিঃ	রাত ৯টা নিউ কোচবিহার	প্রতিদিন	২৩৪৩ আপ দার্জিলিং মেল নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছাবার পরে (এন জে পি) গৌহাটিগামী সুপার ফাস্ট ট্রেনে যেতে হবে। সেটি নিউ কোচবিহার হয়ে যায় : সকাল ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে গাড়ী পাওয়া যাবে — (১) লোহিত এক্সপ্রেস (২) নর্থ সুপার ফাস্ট এক্সপ্রেস
৩১৪১ আপ	তিস্তা তোর্ষা এক্সপ্রেস (কাটোয়া হয়ে)	শিয়ালদহ	বিকাল ১-৪০মিঃ	সকাল ৭-৪০মিঃ নিউ কোচবিহার	প্রতিদিন	
৩১৪৭ আপ	উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (কাটোয়া হয়ে)	শিয়ালদহ	রাত ৭-৩৫মিঃ	সকাল ১০-২৫মিঃ নিউ কোচবিহার	সপ্তাহে ৩দিন সোম, বুধ, শনি	এছাড়া এন জে পি থেকে সিটি বাসে চেপে তেনজিং নোরগে বাস স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে প্রতি ৩০ মিনিট পর পর বাস পাওয়া যাবে। সুপার ফাস্ট বাস ধরতে পারলে তিন ঘন্টায় (বাইপাস হয়ে) কোচবিহার শহরে পৌঁছানো যাবে।
২৩৪৩ আপ	দার্জিলিং মেল (বর্ধমান-বোলপুর)	শিয়ালদহ	রাত ১০-০৫মিঃ	সকাল ৮-৪০মিঃ নিউ জলপাইগুড়ি	প্রতিদিন	
৩১৪৯ আপ	কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস	শিয়ালদহ	রাত ৭-৩৫মিঃ	দুপুর ১২-০০টা আলিপুরদুয়ার জংশন পর্যন্ত	সপ্তাহে ৪দিন মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র, রবি	শিলিগুড়ি জংশন হয়ে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত ডুয়ার্স-এর চা বাগান এবং রিজার্ভ ফরেস্ট অধ্যুষিত অঞ্চলের মধ্যদিয়ে ট্রেন যায়। অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে এই ট্রেন ভ্রমণের আকর্ষণ। আলিপুরদুয়ার থেকে কোচবিহার যেতে ৩৫ মিনিট সময় লাগে। আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনে স্বেচ্ছাসেবক ক্যাম্প থাকবে। সেখান থেকে সম্মেলন মূল ক্যাম্পে পৌঁছাবার ব্যবস্থা থাকবে।
৫৬৫৯ আপ	কামরূপ এক্সপ্রেস	হাওড়া	বিকাল ৫-৩৫মিঃ	সকাল ৯-৩৫মিঃ নিউ কোচবিহার	প্রতিদিন	ব্যাণ্ডেল, নবদ্বীপ, কালনা, খাগড়াঘাট, আজিমগঞ্জ, কাটোয়া হয়ে
২৩৪৫ আপ	গৌহাটি-সরাইঘাট এক্সপ্রেস (সুপারফাস্ট)	হাওড়া	বিকাল ৩-৪৫মিঃ	ভোর ৫টায় নিউ কোচবিহার	সপ্তাহে ৩দিন বুধ, বৃহস্পতি, রবি	

বিঃদ্রঃ ● ট্রেন ছাড়াও প্রতিদিন এস্প্ল্যানেড থেকে সরাসরি কোচবিহার পৌঁছাবার উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের বাস সার্ভিস আছে। বাসগুলি যথাক্রমে ঃ সুপার বাস ছাড়ে দুপুর ১২টা নাগাদ, পৌঁছায় সকাল ৬টায়। রকেট বাস ছাড়ে সন্ধ্যা ৮টা, পৌঁছায় দুপুর ১২টায়।

● নিউ কোচবিহার রেল স্টেশনে অভ্যর্থনা সমিতির ব্যানার সহ স্বেচ্ছাসেবক ক্যাম্প থাকবে। সেখান থেকে কোচবিহার শহরে মূল ক্যাম্পে প্রতিনিধিদের নিয়ে যাবার ব্যবস্থাদি থাকবে।

● যাঁরা কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত আসবেন, তাঁরা নিজ নিজ জেলা সমিতির মাধ্যমে পূর্বেই অভ্যর্থনা সমিতিকে জানাবেন। সেই অনুসারে ব্যবস্থা রাখা হবে।

সমরেন্দ্রনাথ সাহা
কার্য্যকরী সভাপতি
অভ্যর্থনা সমিতি, পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন
কোচবিহার, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

সমিতির পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন শেষে কোচবিহার থেকে কলকাতা ফেরার জন্য ট্রেনের সময় নির্ঘন্ট

এক নজরে

ট্রেন নম্বর	ট্রেনের নাম	ট্রেন ছাড়ার সময়	শিয়ালদহ/হাওড়া	সপ্তাহে কতদিন এবং কোন্ কোন্ দিন ছাড়ে	
৩১৪২ ডাউন	তিস্তা তোর্ষা এক্সপ্রেস	সকাল ১১.৫০ মিঃ	শিয়ালদহ সকাল ৬টা	প্রতিদিন	
৫৬৫৬ ডাউন	কামরূপ এক্সপ্রেস	বেলা ১.৩৫ মিঃ	হাওড়া সকাল ৬টা	প্রতিদিন	
৩১৪৮ ডাউন	উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (আহমদপুর, বোলপুর, বর্ধমান হয়ে)	বিকাল ৪.৪৫ মিঃ	শিয়ালদহ সকাল ৮.৫০মিঃ	সপ্তাহে ৩দিন	মঙ্গল, বৃহস্পতি, রবি (নিউ কোচবিহার থেকে)
২৩৪৪ ডাউন	দার্জিলিং মেল (নিউ জলপাইগুড়ি হয়ে)	রাত ৭.৪০ মিঃ	শিয়ালদহ সকাল ৬.১৫ মিঃ	প্রতিদিন	
৩১৫০ ডাউন	কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (আলিপুরদুয়ার থেকে)	বিকাল ৪.৪৫ মিঃ	শিয়ালদহ সকাল ৮.৫০ মিঃ	সপ্তাহে ৪দিন	সোম, বুধ, শুক্র, শনি
৫৬৫৮ ডাউন	কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস	সকাল ৫টা	শিয়ালদহ রাত ৯টা	প্রতিদিন	

সমরেন্দ্রনাথ সাহা
কার্য্যকরী সভাপতি
অভ্যর্থনা সমিতি, পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন
কোচবিহার, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

স্টুডেন্টস হেলথ হোমের প্রসারিত পরিষেবা

১) সান্ধ্য স্বাস্থ্য পরিষেবা (শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য)
(সহযোগিতায় নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি)

- চোখ, নাক-কান-গলা, মধুমেহ, স্নায়ু, দন্ত ও হৃদ্‌রোগের চিকিৎসা।

২) সর্বসাধারণের সুবিধার্থে

- প্যাথোলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, ই ই জি, আলট্রাসনোগ্রাফি, ই সি জি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, এণ্ডোস্কোপি, এক্সরে ইত্যাদি পরিষেবা।
- প্যাথোলজি নমুনা সংগ্রহ (সকাল ৮টা থেকে ১০টা)
- ই সি জি/এক্সরে (সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা)
- ই ই জি (দুপুর ২টা থেকে বিকাল ৪টা)

ঃ অনুসন্ধান ঃ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্টুডেন্টস হেলথ হোম
১৮২/২, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড, কলকাতা-১৪
ফোন ঃ ২২৪৪-২৮৬৬/৮৭৩৮, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২৪৬-৭১২০, ই-মেল ঃ shh-cp@vsnl.net

১লা জুলাই, ২০০৪ থেকে কার্যকরী হবে।

Teachers' Journal

ORGAN OF THE ALL BENGAL TEACHERS' ASSOCIATION

Editor : Sri Prasanta Dhar ★ Joint Editor : Sri Sibaprasad Mukhopadhyay

VOL. LXXXIII NO. 8 AUGUST, 2004

Editorial

EDUCATION AND THE UPA GOVT

The Common Minimum Programmes (CMP) formulated by United Progressive Alliance should be implemented within the stipulated timeframe. The electorate of the country have rejected the previous regime for its anti-people economic policies and parochial endeavours. The plinth of the Indian democracy rests on secularism, pluralism and tolerant attitude. As a natural sequal, people aspire the new incumbents at the centre should repair the damages caused by the previous govt without wasting any time. The BJP-led NDA govt attempted to suffocate the perceptions of a Welfare State. The autocrats care a fig for common people's benefit, since they work at the behest of privileged class. The denial of education is the greatest denial. The commercialisation of education as preached by the NDA govt greatly narrowed the scope of democratic education system.

Pledges and translation of the items into actions are just different things. Sedate thinking, realistic plannings and constant vigil are pre-requisites for achieving the target. The finance minister of the UPA govt on last 08 July has submitted the budget in the Parliament for 2004-05 fiscal year. The said minister in his speech iterated that some positive steps would be taken up to boost up the economy. The UPA govt must not forget that the people ousted the NDA govt in the 14th Lok Sabha elections for its anti-people, anti-education policies. The UPA regime has been installed for redressal of the past misdeeds. Accordingly, after assuming power the Central govt has declared Common Minimum Programmes framed in unison with the alliance members and the left forces. It has correctly been asserted that the CMP will show directions for activities to be performed by the present govt at the centre.

The promises of the CMP include allocation of 6% of the GDP on education in phases. Half of the total amount will be

spent on Primary and Secondary education. Added to this, 2% cess will be imposed by the Central govt and the entire sum is earmarked for universalisation of education and upgradation of its quality commensurate to the demand of the time. And this amount will ensure sustained supply of mid-day-meal to the learners of primary schools. Moreover, new 100 Industrial Training Institutes will be set up every year, and elevation of the quality of those institutions will be effected. It has been mentioned the govt will lend support to the meritorious but poor students studying in IIT and AIIMS of the country. All these assertions are just laudable and praiseworthy.

True, it is too much an expectation that the govt will fulfil all the pledges soon after assuming the power of governance. But there must be reflections in the activities of the govt. The positive endeavours are to be initiated so that the people can realise that pro-people policies are on the move. Since Independence tall promises were made, and people could not notice any positive change in the field of education. Hence, the present govt must be true to its pledges so as to win the confidence of all sections of people.

There is fundamental difference between the Congress govt of the past and the present Congress-led UPA govt. The people, at least, entertain this idea for the reason that the objective reality is quite different. The budgetory allocation on education for this fiscal year is marginally higher than NDA govt's budget so far as the secondary level of education is concerned. True, there is rise for universalisation of elementary education. Yet, the increase is too meagre to achieve the target of Sarba Siksha Abhiyan. It's crystal clear that there is a wide gap between the pledge in this respect and the reality of to-day.

It is noticeable that the present govt has adopted some positive measures to cleanse the environment of education which was poisoned by the BJP-led NDA govt in corporating communal inputs in the domain of school education especially. The previous govt strived relentlessly to spread the RSS philosophy of intolerance and hatred. Communalisation of curriculum and syllabus, and distortion of history aimed to build up parochial and sectarian mindset. It is also mentionable that UPA govt is working in favour of taking the views of the state govts before taking any basic policy decision pertaining to education. It's good jesture and federal polity demands such an endeavour. But the budgetory allocation is the spanner for measuring the appetite for spread of education and quality assurance.

Despite all these realities, the teaching community entertains the idea that the UPA govt will strive sincerely to materialise the items of CMP. Education ensures total development and empowerment. The persons working in the arena of education, persons serious about the spread of education, and the people just believe that education will not be denied of justice.

13 August 2004

Call Of The Association

Amal Banerjee
General Secretary

Education and development are inseparably inter-related. This truth has been aired since the dawn of civilisation. Education develops the individual and thereby contributes affluently for the total development of the society. Civilisation always marches ahead receiving the bliss of enlightenment. Knowing fully well this eternal actuality, the indigenous rulers preferred to step into the old shoes of colonial masters for the very reason that the persons who held the rein of administration were aware that education awakens an individual. Our prestigious Association since its birth has struggled for widening the horizon of educational opportunity. We must tune more aptly ourselves with the legacy of our endeared Association.

The President of India on the occasion of 58th Independence Day has asserted that the right to education has to be made a reality. He has further iterated that the prime duty of the new govt is to extend educational opportunity to the billions of children of the underprivileged class. It has to be remembered that education is the birth right of a child. Only incorporation of this Right in the Constitution has no meaning, but this mandatory duty of the State must be made a reality. For this, public awareness is to be built up. At present, the number of illiterates reads so high that India is being considered as a backward country so far as the coverage of elementary education is concerned.

Sarva Siksha Abhiyan is a movement for prividing Elementary Education to all the children. The new nomenclature of this movement is Education For All (EFA). It has to be kept in mind that Formal Education has no substitute. The Open Schooling and Non-formal Education can only play a supportive role. Open Schooling and Non-formal Education have much relevance for the disadvantaged sections. True, some students have excelled from non-formal mode, but the number is not much. The learners of such a system do not receive the advantage of learner-teacher warmth, peer learning and regular educational inputs. The fruits of EFA are now present in the classroom and we must treat them with more affection and love. We should endeavour to help them to blossom.

There is no denying the fact that large classroom is a reality, teacher-pupil ratio is not as per prescribed one. Large class is a challenge and we must strive to accept the challenge resorting to cooperative learning process like group activity, pair learning, peer learning etc. We have in the past faced many challenges successfully. Now, lecture method is almost a rejected one. Activity-

based participatory techniques are sure to yield benefits. The main function of the teacher is to ignite the appetite to learn. Moreover, teaching community has the ability of innovating new tools of learning, be the classroom large one or not. We have to accept the objective reality which we do in our real life as and when exposed to.

Zonal level fifth triennial conferences are being completed by now, and sub-division level conferences are on progress. In the conferences the academic issues are to be discussed and attempts should be made by the district council members and the sub-divisional executives sothat the delegates may secure information of the past. Our Association has secured the present height for its correct vision in the vast domain of education. Modern educational views always have found a place of honour in the educational activities of the Association. People rever ABTA for its timely interventions to protect the interests of students. The welfare of the learners should be our main concern.

Now we have many members who have joined the profession of teaching being selected by the SSC. These young teachers and the new members have fragmentory knowledge about the history of the Association. The sub-divisional conferences must highlight the legacy of our rich heritage. And the reports of the conferences are to be discussed at the base level for strengthening the plinth of the Association further. Cultural Competetions are being held with definite objectives; the leadership must go for introspection.

ABTA has published "Acharya Kahini" which contains writings of Vidyasagar, Bankim Chandra, Rabindranath and down to Syed Waliullah (1918-1971) and Tapobijoy Ghose (1937-1990). All the writings describe dedication, sacrifice and educational struggles of the teachers. The stories speak about the lofty ideals of the teachers. This book can imbibe the teachers and the students alike.

Consumerism is not the last word—it has no power to destory the basic humane feelings. But we can create an environment conducive for cultivation of humane virtues—the staff room is the best place for such an endeavour. The task is not an easy one now, but 'If there is a will, there is a way'.

Long Live ABTA
Long Live Teacher-Student-Guardian Unity

16 August 04

Passing of a scholar-politician

A HOMAGE SANS ILLUSION

ASHOK MITRA

It will be fatuous to claim that time is out of joint. Nothing of the sort. Time present is regulated by co-ordinates qualitatively different from those in control of affairs even a couple of decades ago. The passing of the eminent scholar-politician, Hirendranath Mukherjee, therefore failed to bestir the national media, print as well as electronic. There was, besides, far more exciting fare on the day : a former Miss India had hanged herself in her Mumbai apartment. First things first.

Have a heart, the very idea of a scholar-politician sounds absurd in the current ambience. These days a politician turns into a celebrity either because he carries the halo of having committed a hundred murders or because of the other halo of having come to pots and pots of money through diverse, mostly extra-legal, means; sometimes he wears, proudly, both haloes. Hiren Mukherjee was an incongruity in this context. Moreover, he chose to live too long and, in the process, rendered himself into a greater irrelevance. His death was bereft of news value.

He, in short, was an anachronism. It is pointless to recollect that, half a century ago, Mukherjee was Jawaharlal Nehru's favourite parliamentarian. Every time the communist member of parliament would participate in a debate, Nehru would remove himself from his South Block office and scamper into Parliament House, he could not possibly miss Hiren's speech. What particularly drew the admiration of Nehru and others was the splendour of Hiren Mukherjee's vocabulary and his total command over the manner in which he deployed it. His accent was impeccably Oxonian. That was the least part of it though. It was Mukherjee's passion, welded onto his ideology, which mattered. To have passion, he was determined to prove, does not harm the cause of ideology; it enhances it. Those not subscribing to the ideology would still salute the integrity of this most passionate man.

Hiren Mukherjee's oratorical skill was not confined to English alone. His Bengali diction was equally rich; his Urdu did not lag behind either. There was at least one occasion when, in the Lok Sabha, either needled by a colleague or yielding to the entreaty from another, he spoke in Sanskrit – the grammar faultless and the intonation perfect – for a full twentyfive minutes. That was one of the most memorable moments in the history of the Lok Sabha.

Passion is nonetheless an empty box. One needs faith and empathy with the cause to transform passion into throbbing phenomenon. Hiren Mukherjee's loyalty to the cause of the exploited millions was much more than just cerebral. He broke out of his class confines, whenever the compulsion arose, even while retaining the external norms of bourgeois existence. His civilization did not prevent him from taking headlong the establishment perpetrating umpteen blatant acts of indignity or injustice. He would write in English and

Bengali with the same felicity with which he spoke in the two languages. He could have been, and on occasion was, a full-fledged man of letters. Whenever the need arose, he did not hesitate to turn himself into a hack of a pamphleteer, wielding his pen to mobilize social resistance against the forces of repression in society. The same urge would again impel him to engage in brisk trade union activity.

He would, with facile ease, wade in and wade out of *shlokas* from the *Vedas* and the *Upanishads*. These hymns provided him with a structure of morality which he could reconcile with the tenets of Marxism. The *Vedas* talked of the triumph of truth and goodness over evil and shoddy *modus operandi*. The socialist ethos, he would argue, says the same things, and with beautiful precision.

He trained as a barrister-at-law, and he sacrificed his profession for the sake of the party. He loved teaching and the company of colleagues and adorning students. The teaching career too came to a surcease once the party commissioned him for the parliamentary assignment. He took all this, as is the wont of a disciplined cadre, in a philosophical stride. In those halcyon days in the mid-Fifties a species of political glamour got attached to his name. Such celebrity status did not disorient him. He remained, all through, the donnish politician with an inflexible moral sense and an unflappable belief in the decencies of life. The collapse of the Soviet system shattered his inner dreams, but there was never any question of forsaking the faith. And he would still protest, outspokenly, whenever he would come across a gross act of misdemeanour on anybody's part. A famous writer, for a time lionized by the left, was at the receiving end of Hiren Mukherjee's severe tongue-lashing because he took for a shameful ride a lady who had once devoted her care and resources to advance his career. The constraint of past friendship did not deter Mukherjee from speaking against the writer. There was a relatively more recent instance : a minister of a state government with left credentials dared to write an out-of-turn letter to the Union government imploring the conferment of an official award on a shady businessman a merciless Mukherjee made mincemeat of the erring minister in a public protest.

Marxism was his religion and he was not ashamed to wear it on his sleeve. No weather-cock, he would not be shaken from the moorings of his faith howsoever the external circumstances might change. The Communist Party of India had learned the lesson of its life while coping with Mukherjee's orthdoxy in the wake of the revelations at the Twentieth Congress of the Soviet party. What Nikita Khruschev told the party rank and file caused a major convulsion across the globe including in India. The Indian party split, leading to the founding of the Communist Party of India (Marxist), away and distinct from the parent party. Hiren Mukherjee's heart broke at the party's division. While he stayed with the CPI, that did not stop him from extolling the greatness of Joseph Stalin, the true builder, in his judgment, of the Soviet Union. It was a most unusual spectacle : the CPI was embarrassed by Hiren Mukherjee's Stalin idolatry, but could do little about it. Till the very end, Mukherjee remained as a bridge between the two parties, and perhaps had more adherents in the CPI (M) than in the CPI.

Another episode, even further in the past, comes to mind, June 1941, Hitler decided to invade the Soviet Union; to the Indian comrades, the hitherto imperialist war was now transformed into a people's war. Anything to save the USSR; partisans in Calcutta, Mumbai, Lucknow and Delhi were astirunits of the

Friends of the Soviet Union cropped up in these centres Hiren Mukherjee was in the limelight, mobilizing resources to go into the war effort that might, directly or otherwise, help the fighting masses of the Soviet Union. He edited a volume of essays in support of the Soviet cause and wrote a vibrant preface to it with the boldest invocation : "Yes, the Soviets are my fatherland." The bulk of his countrymen would certainly not have gone along, but Hiren Mukherjee had both the courage of his conviction and the conviction of his courage. If the Soviet Union went down, he reasoned, it would be death knell for the working class across the continents. The Soviet Union was his fatherland, and he must shed his last blood to save it.

Tales of such strange rites cannot but baffle the present generation. The nation's media know what is what : Hiren Mukherjee was an obsolete commodity, his death was a non-event.

By Courtesy : The Telegraph, 6 August 2004

NOW AVAILABLE

ROPA, 1998

Price : Rs. 10.00

CONTACT :

A. B. T. A. Office

Satyapriya Bhawan

P-14, Ganesh Chandra Avenue

Kolkata-700 013

STERN DUTY AHEAD – MEET THE SOCIAL CHALLENGE

Sumay Ray

For the past few decades the issue of education has been in the limelight. Demand for education has increased consequent upon a number of changes in the socio-economic fabric of life. Initiative has been taken to make education available even to the weakest sections of the society thereby expanding the periphery of education prevailing as a legacy of the imperialist design of discriminatory education policy. State power continued to be reluctant and non-chalant (it is the class character of the states ruled by the privileged class). Govt. of West Bengal expressed its sincerity by earmarking around 25% of its budget allocation on education, by making provision for various changes in school management with an eye to expanding democracy in the field, by making pro-people changes in education policy and soon. But the goal remained to be as distant as before.

Number of drop-outs still ailed the system, common school system has been put before a serious challenge so much so that it apprehends extinction and quality education is still a far cry. Education has tilted more and more towards elitism (as distinct from mass education). To make the matter worse. By this time the education scenerio has begun to feel the diabolical impact of globalization on education and the ailing situation still aggravated.

Meanwhile an important change took place on the other direction. A verdict from the Supreme Court and a handful of other factors compelled the otherwise reluctant Central Govt. to launch a project for ensuring universal elementary education in order to be true to constitutional commitment. Project SSA [SARBA SIKSHA AVIJAN), a time-bound joint venture of the Central and respective State governments was taken up with an eye to ensuring elementary education for all children within the age group 5+ to 13+ on the basis of four key principles : universal access; universal enrolment; universal retention and quality education. It is a multi-dimensional project in which people from almost all walks of life is to be involved. The teaching community is the chief architect of the last two corner stones of SSA i.e. universal retention and quality education. The primary pre-condition of successful implementation of this is : teachers are to shake off age-old practices and evolve and adopt new methodology. Motivated by the sense of indebtedness to the society they have to change their

existing mental make-up. The objective reality—large class-room, unequal level of competency originating from unequal socio-economic background stands on one side and social obligation and professional responsibility of the teaching community on the other. Educational activity is to be performed and made fruitful in this backdrop.

Herein lies the relevance of three-pronged endeavour that constitutes the new methodology : participatory approach to managing class-room situation, continuous evaluation and remedial lessons. Let us dive a little deep into the items mentioned above since those are the very corner stones upon which the edifice of universal elementary education is to be built.

Following traditional methodology most teachers prefer 'siksha daan', transmission of knowledge keeping the class fully or partly passive. Eloquent lecture followed by a few token comprehensive questions and the class is over. This method has very little efficacy in the present day context where large class-room and quite a good number of first generation learners is a grim reality. Apart from this, knowledge is something that can never be handed overbits of information may be transferred but not knowledge. It is a process of assimilation of experiences. This process is to be initiated with deft handling. Entire syllabus of each subject is to be divided into several units and sub-units in the Comprehensive Annual Calendar (of curricular and co-curricular activities) and then class-room interaction is to continue following participatory approach. Each and every learner is to participate in the lesson actively by doing something on their own. Teachers are to enter into the class-room being equipped with the basics of participatory method of learning. The specific learning competency will be the target of learning (say, the use of simple past tense in english grammar in class V, principles of ratio-proportion in arithmatics in class IX, or, the shape of the earth in geography in class IX etc.). With a view to reaching that particular target, class-room interaction is to be so planned as to enable the learners master the four stage competency chain viz, i) knowledge (information) related competency, ii) the competency of understanding (it is distinct from acquisition of bits of information—learners are to be motivated to make use of their reasoning power, imagination and so on i.e. various intellectual faculties and reach a new horizon of competency by meeting varying degrees of cognitive challenge); iii) the competency of application which aims at using the experience/competency acquired in one situation to similar other situations. While the understanding gives conceptual clarity; competency of application gives it a solid footing by enabling the learners to use it independently, and lastly iv) The competency of skill-capacity to create something a new; the skill of creativity. This four stage competency chain lies at the very root of assimilation of experiences i.e. knowledge, a very intricate intellectual exercise.

It is clear, this 'knowledge' can never be transferred, handed over or imparted; it consists in affecting the cognitive domain of a learner. This can hardly be done keeping the learners passive. With the help of

conscious, careful, planned handling of the class-room situation, evaluating and gauging every minute the level of comprehension of young learners in the class-room, a successful teacher can reach the target. A competent and efficient teacher's innovative eye can easily distinguish between advanced or backward learners' progress in the class-room and instantly revise the plan of handling the class- room situation accordingly—learners can be regrouped to reap the benefit of group discussion, a few monitors can be selected to monitor the goings-on inside the class-room. A teacher with a sensitive mind can explore numerous other devices only if the traditional, age-old outlook is changed. Their complacency will be like Derozio : "..... expanding like the petals of young flowers/I watch the gentle opening of your minds....."

One thing might not be out of place here– it is the concept of value education.

Inculcation of values is also an objective of education. Some prefer incorporation of value education as a curricular subject. But this is a faulty approach. Inculcation of values are to follow as an offshoot of regular educational activity. Every subject is value subject; every teacher is value teacher although the most effective vehicle of value education is literature. Keeping this maxim in view it should be the bounden duty of every teacher to explore value areas from within the subject concerned and carry on class-room interaction in such a way as to inculcate the particular value in the learners' mind over and above infusing in them the desired competency. All that is needed is a sensitive mind and resourcefulness.

The comprehensive concept of continuous evaluation comes next. It is poles apart from traditional concept of examination. After the initial phase of evaluation in course of class-room interaction comes, as an item in the Comprehensive Annual Calendar, unit test and remedial lessons. These form a part of the process of continuous evaluation since they go a long way in assessing how far the learners have succeeded in attaining the desired competency. Finally, comes periodic exams that help all evaluate a learner's progress of learning. The learners themselves also evaluate their level of competency during the entire process. It is the essence of continuous evaluation. There is a broad consensus (of opinion) in the country on the futility of the existing system of examination; still it is the dominating practice in the education scenerio so much so that success in the exam is the be-all-and-end-all of education, no matter what peril follows it. Concept of continual evaluation is an ideal substitute for the ineffective system prevailing.

About large class unit. In the arena of school education, thanks to a number of socio-economic factors, one will mark a ubiquitous feature: number of school goers has had a tremendous boost. In quite a good number of cases class units are large in size, it is a reality for which the society can rightly boast of. The issue of handling class-room interaction with the tool of participatory method has been discussed earlier. Here the issue is the actual size of largeness analysed from macro point of view. The last annual survey report (2003-04) revealed that the teacher-taught ratio in

West Bengal is somewhere below 1:40. Evidently their is disparity in respect of teacher-taught ratio—some class units are over burdened while others are not. Certain factors, non-academic in nature, such as elitist bias, silly craze of preference of one school to others, geographical predicament and so on lie behind this grim reality. If the no. of school goers can be equitably allocated to suitable schools without any prejudice the problem of disproportionate class-room will wither away. What remains, therefore, is : intricate non-academic issues have been making the matter worse. The solution depends on intensive campaign on academic lines.

Next the issue of guaranteeing opportunities to all learners. For decades (nay, centuries) learners from some sections of the society have been debarred from attending schools—a case of denial of education to the weaker sections of the society. Of late they are being offered access to schooling. They are labelled as first generation learners with almost zero schooling experience and no support from family or surrounding. It can't be expected that they will be able to keep pace with those coming from privileged classes of the society. Hence they need additional and affectionate care and nurture. Handling the class-room situation providing equal opportunities for all will not yield desired goal i.e. quality education. Extra effort, tact and sensitivity are essential for those who are sure to lag behind. Here lies the relevance of the concept of 'equity vis-a-vis equality'. 'Equity lexically means the application of the principles of natural justice in particular circumstances where the existing laws would not allow fair or reasonable result. Equality consists in equal treatment of all. It is evidently different from equity. Handling of class-room situation with equal opportunities for all can hardly lead us to a position where quality education is ensured for all. Slow and weak learners badly need extra care, patient and tactful nurturing in order to cross the trouble areas that may crop up in course of learning process. It is a prolonged, protracted task starting from class-room interaction stage extending upto remedial lesson phase coming after unit test through which weakness in the process of acquisition of learning competency is finally identified. It is obvious guaranteeing 'equity', as distinct from 'equality' is an uphill task but the height can be scaled with a sensitive mind equipped with the new methodology.

Then follows the vital issue of number of effective teaching-learning days and hours as distinct from working days and hours. In school calender working days refer to total no. of days in an academic year (i.e. 365 days) minus sundays and holidays. A day when no teaching-learning is done may also be a working day. A day when all concerned assemble, hold a short condolence and work is suspended for the rest of the day is also a working day on count. Effective teaching-learning day and hour refer to days and hours when class-room interaction is going on. The sorry state of affairs is that at present number of effective teaching-learning days has dwindled around a hundred and twenty to hundred and forty, courtesy numerous non-academic factors. The actual need for adequate no. of effective teaching- learning

days has not gone down. A careful scrutiny of the contents of various subjects in the curriculum will reveal that al least two hundred effective teaching-learning days is indispensable for doing justice to the existing syllabus. Quality of education is impaired proportionate to the curtailment of no. of effective teaching-learning days. Keeping in view all the factors like festivity, seasonal hazards, social and other occasions etc. number of holidays has been restricted to sixty five days in a calender year over and above the Sundays. This is a pragmatic step with an eye to meeting the new social challenge of universal elementary education. There is no other alternative way to ensure increase of effective teaching-learning days. This curtailment of no. of holidays should not be mingled with curtailment of 'leave.' Leave is governed by leave rules while holidays are determined on the basis of social need. They vary from country to country, state to state depending on tradition, need etc. In West Bengal no. of leaves has been increased — full pay commuted leave for thirty days in the service period has been granted keeping Half-Average Pay leave accrual and accumulation intact; Maternity leave has been increased. Evidently there is no curtailment of 'leave'. Holidays are anything but exclusive privilege of the employees of Non-Govt. Educational Institutions - millions of educands and their guardians and well-wishers come within the circle of beneficiaries who enjoy these holidays. The change envisaged is lessening loss of working days to provide opportunity for the betterment of class-room interaction. What is needed at this juncture is to remain co-operative and vigilant for making proper use of these extra days.

These coupled with a sympathetic attitude can help a lot in bringing about the much needed change in the field of education. What is important above everything else is a change of outlook— a new feeling, a new vision is that the education world demands most. It is future that alone can tell how the teaching community responds to it.

Human Beauty, Art And Philosophy In Rabindranath Tagore's Literature

Manoranjan Das
Kendua Mahendranath High School, Kolkata-84

Rabindranath Tagore, one of the greatest poets of the world, has diverse sorts of art and beauty through the notions of metacriticism and appreciations basing on philosophical outlook. He has the will to concern with deeper philosophical form like the meaning of nature's symbolic acceptance, bearing the concept of man or culture with the periphery of knowledge. The great poet writes with conviction and enormous erudition of subjects qualifying with the objects of life and reality where a panoramic mood and mind are for feeling.

He asserts that most of the writings produce the enlivening shock and enjoyment of a multi-dimensional metaphor as the leaping from language to language, and locus to locus with his identical concepts; and, partly and partially for this reason perhaps his notions are seldom worked into the new relations with the arrival of new context.

The great poet feels that all the human beauty, art and philosophy are hidden into the religion of men, where the true vision is responsible for inhaling the creation in relation to the universal and eternal idea, centering the personal relationship with deepening of consciousnees; and, the moments philosophy and history of height are meeting to a creative comradeship. He realises that humanity in relation to infinitive entity is closed to the need of love and co-operation. Thus we may add.

"To this being I was responsible; for the creation in me is his as well as mine. It may be that it was the same creative mind that is shaping the universe to its eternal idea; but in me as a person it had one of its special centres of a personal relationship growing into a deepening consciousness. I had my sorrows that left their memory in a long burning track across my days, but I felt that moment that in them I lent myself to a travail of creation that over exceeded my own personal bounds like stars which in their individual firebursts are lighting the history of the universe. It gave me a great joy to feel in my life detachment at the idea of a mystery of a meeting of the two in a creative comradeship. I felt that I had found my religion at last, the religion of man, in which the infinite became defined in humanity and came close to me so as to need my love and co-operation".[1]

The great humanist, Rabindranath Tagore, considering aesthetic values, retained for the original association with sensuousness and, does the growth of discipline, and, the formula of passsion is

naive and examined, bearing the notions of sensibility and pleasure as a restraining fixity of meaning for men, always pejorative. He always searches beauty, art and philosophy through the life and Lord where awkwardness is dealing with self-recording of authentic consciousness, referring the innermost spirit of being through pain and delight for hearts surrendering. Thus he writes.

"This idea of mine found at a later date its expression in some of my poems addressed to what I called *Jivan Devata*, the Lord of my life. Fully aware of my awkwardness in dealing with a foreign language, with some hesitation I give a translation, being sure that any evidence revealed through the self-recording instrument of poetry is more authentic than answers extorted through conscious questionings;

"Thou who art the innermost Spirit of my being,
art thou pleased,
Lord of my Life?
For I gave to thee my cup
filled with all the pain and delight
that the crushed grapes of my heart had
surrendered .."[2]

Therefore, Rabindranath Tagore, considering aesthetic judgment of mind and life through devotion, always refers that notions of distinguished delight or pleasure as pure possibility of future is the concept of eternal and external logic of entailment. He, entangling with the rhythm of colours and songs of time through incidents or accidents, exposes the desires and dreams for storing the alchemy of art, basing the songs of autumn and spring for mature moments. Thus he writes,

"I love with the rhythm of colours and songs the cover for thy bed,
and with the molten gold of my desires
I fashioned playthings for thy passing hours,
I know not why thou chosest me for thy partner,
Lord of my life!
Didst thou store my days and nights,
my deeds and dreams for the alchemy of thy art,
and string in the chain of thy music mysongs of autumn and spring,
and gather the flowers from my mature moments for thy crown?"[3]

Rabindranath Tagore enforces the meditative motion of mind, defining the indication of general philosophical outlook, assures the theme of art as a kind of metaphysical motive of mind; and, the truth behind the eternal and progressive positivity of any relation is being the symbolic combination of essential identity. He exposes the norm of life through human beauty, art and philosophy as elaborated in Kalidas's *Meghaduta* where the effort and atmosphere of love and human virtues are formal in the highest degree of intensity through poetic medium as artistic skill through whispering tress and ripples of river. Thus we may add,

"..... the effort to express the atmosphere of love and sorrow, within the limits imposed by the exacting formal requirements of the poetic medium, demands of the poet, the highest degree of intensity and concentration. With superb skill and artistry he makes the whole nature, change suddenly to gather amidst the whispering trees and ripples of the brook the desire and sorrow."[4]

The great philosopher poet, Rabindranath Tagore, deflating the myth of progress, always helps feeling for evoking the human existence. As a philosopher, in most of his

moods, he was realist and ideologically archaistic; and, for much of it, cultural surroundings through reality are together with the response of man or manhood. He, remaining the modernization of thoughts. has the schooling to uplift human virtues through works and activities. Accepting the gaze of heart, Rabindranath Tagore offers to inhale the norms of light, driving the nights motivation. Thus he writes,

"I see thine eyes gazing at the dark of my heart,
Lord of my life,
I wonder if my failures and wrongs are for given.
For many were my days without service
and nights of forgetfulness:
futile were the flowers that faded in the shade not offered to thee.
Often the tired strings of my lute
Slackened at the strain of thy tunes.
And often at the ruin of wasted hours
my desolate evenings were filled with tears."[5]

Moreover, he proposed the philosophical account basing on truth where the views of art is related really on works, figures and transformation of nature; and, repudiates the assumption that is essentially roamed with beauty where the view of presentation is compared with moment's mooring, generalizing the base of artistic traditionality. Rabindranath Tagore's thoughts of human beauty, art and philosophy are morally kissed with the renewing of fresh form of delight as the touchable ceremony of life, modifying the universal utility of possible performance of life and experience. Thus we may add,

"But have my days come to their end at last,
Lord of my Life,
while my arms round thee grow limp,
my kisses losing their truth?
Then break up the meeting of this languid day.
Renew the old in me in fresh forms of delight:
and let the wedding come once again
in a new ceremony of life."[6]

Evaluating the well prescription of meaningful structure of society, he mentioned the obligation of men. It should be worth mentioning the Rabindranath Tagore has been a search for authenticity, a meaningful living, spontaneous, homogenous and traditional; and, he found men in estrangement from the Spirit and from perfection. He accentuates that philosophical anthropology is not merely descriptive, but it is also revisionary; and, human situation as men found it is desirable and this implies a transcendence of possibility.

He, understanding the consciousness towards realisation, had drawn pictures of July through caressing of shadow like clouds into the nature. Thus we may add,

"You will understand from this how unconsciously I had been travelling toward the realisation which I stumbled upon in an idle moment on a day in July, when morning clouds thickened on the eastern horizon and a caressing shadow lay on the tremulous bamboo branches, while an excited group of village boys was noisily dragging from the bank an old fishing-boat; and I cannot tell how at that moment an unexpected train of thoughts ran across my mind like a strange caravan carrying the wealth of an unknown kingdom."[7]

Ragarding the evaluative expression of simultaneous senses, he appeared through his creation, distincting the sentiment self and intellectual self that was celebrated for rational and human identity. He accepts "The soulful or sentimental self enjoys itself in the aesthetic surfaces or natural and artificial things, to which it is akin; the intellectual or spiritual self enjoys their order and is nourished by what in them is

akin to it. The spirit is much rather fastidious than a sensitive entity."[8] Thus, according to Rabindranath Tagore the whole manhood comprehends the route of life through human beauty, art and philosophy.

Rabindranath Tagore feels that simultaneous, aesthetic and cognitive experiences and only distinguishable in logic for the betterment of society; and, in respect of the simultaneity of sensitive and intellectual selves of man, he is always univocal in some moods he appears to allow the term 'manhood' to be applied to the sensitive self where real sensation is the wealth of human distinct knowledge. Basing on the norm of time and truth, he touches the real of expression whore the moments are spelling for lessons to carry the information of harmony leveling with the unity of vision. Thus he writes,

".....My mind touched the creative realm of expression, and at that moment I was a no longer a mere student with his mind muffled by spelling lessons, enclosed by classroom. The rhythmic picture of the tremulous leaves beaten by the rain opened before my mind the world which does not merely carry information, but a harmony with my being. The unmeaning fragments lost their individual isolation and my mind revelled in the unity of a vision."[9]

As a rule, he argues that mind is the intellectual self of human sensitive self, referring the position of will through the course of experience knowledge where the entity of emotions and sensations are evapourated. He argues further that the beauty of nature relating to village is a luminous of unity of the truth, entangling the mind's relation with boundless sea where expressions and experiences are ever widening for spiritual work of art, human beauty and philosophy. Thus he writes,

"..... In a similar manner, on that morning in the village the facts of my life suddenly appeared to me in a luminous unity of truth. All things that had seemed like vagrant waves were revealed to my mind in relation to a boundless sea. I felt sure that some being who comprehended me and my world was seeking his best expression in all my experiences, uniting them into an ever widening individuality which is a spiritual work of art."[10]

Rabindranath Tagore, following the form of clear performance of life, shows the simplification of identity of the whole man, which is not integral; and, he seems that indecisive thoughts in point of view descriptive and evaluative import of his expression, and his thoughts should be philosophically evaporating with the reality, the whole and the parts of mind are relatively existed to the meaning of surroundings; and, the self-dependent for something moderates the ocean objective as the sense of dropping of leaves. Thus we may add,

"..... it is really means existence as a finished something, self-dependent something, self-satisfied something. In this sense, a part inside a whole cannot be really 'real', e.g., a leaf is, undoubtedly a real, existent thing; but how can it be called as real as the whole tree, in relation to it, as its part? Is it really very absurd to say that a leaf of a tree is as real as the desert itself, a drop of water is as real as the ocean itself, a nerve is as real as the living body itself, an atom is as real as the material object itself?"[11]

Generally speaking. The Great Gurudev

Poet Rabindranath Tagore evaluates that rational alone is free and the sentimental self, the psychological ego or the sense of individuality is determinable by thy intellectual, 'supra-individual' self; and, however familiar these notions may be, thy are highly troublesome philosophically. He, nominating the norms of normal art, human beauty and philosophy, asserts that necessity is the existence of thought where the single part and status are the whole by exemplifying the chips of stones, clods of earth, blades of grasses are objected around in relation to eyes and the rest. Thus we may add,

"Of course all these are necessary for the very existence of the whole, yet, not separately, but, all in combination. Hence, to take single part and elevate it to the status of the whole is untenable."

"For example, when a leaf has fallen on the ground below amongst other things, like chips of stones, clods of earth, blades of grasses, and the like, then, of course, it is an real as all other objects all around. When, e.g., a grain of dust falls into the eyes of a unwary traveller, it is, of course, real, in relation to eyes and the rest."[12]

As humanist, Rabindranath Tagore emphasis of that the time of manhood is related subjects, bearing the works of the religion of man where the best understanding is mingled with man and humanism. Thus we may add,

"..... notice that the common theme that runs through most of his writing is 'man' and the emphasis of is on humanism and related subjects ..... The best way to understand Rabindranath's humanism is to examine what he calls 'the religion of man', because it is in his writings about 'the religion of man' that Tagore explains in detail his understanding of man and humanism."[13]

On the whole, the literature of Rabindranath Tagore carries the favouring view of man, relating to the reference of life and norm of consciousness, knowledge and realisation where human beauty, art and philosophy are roamed about.

References :

1. The Religion of Men — Rabindranath Tagore/May 2000, p-56/ Visva Bharati Publishing Department/6, Acharya Jagadish Chandra Bose Road, Kolkata-700 017.
2. 1bid.
3. 1bid, p-57.
4. Kalidasa's Imagery in the Maghaduta— Krishna Chandra Roy Chowdhury/ February 1991,p-12/The University of Burdwan/R K Palit, Publication Officer, University of Burdwan.
5. 1bid, p-57
6. 1bid
7. 1bid
8. (F S P, p-13), or, A Return to Rhetoric: Ananda Coomaraswamy's Philosophy of Art/November 1976—April 1977, p-242/ The Visva Bharati Quarterly, Visva Bharati University, Bolpur, Santiniketan, W.B.
9. 1bid
10. Ten Schools of Vedanta, Part-II— Dr. Roma Chaudhuri/September 1975, p-12/ Rabindra Bharati University/6/4, Dwarkanath Tagore Lane, Kolkata- 700 007.
11. 1bid
12. The God of Rabindranath Tagore —Jose Chunkapura/May 2002, p-241/Visva Bharati Publishing Department/6, Acharya Jagadish Chandra Bose Road, Santiniketan, W.B.

Peom

In Memoriam

(Kumbakonam School tragedy)

Hirendra Sankar Bhattacharyya

'Agni' embraced the children and
embarrased the intellectuals.
Parents could not, rather did not imagine;
All the relatives of the country mourned
for the loss–
None to return they had gone forever.

Let the parents remember the smiles of their
beloved
Let the parents forget the devastation
Let the parents feel relieved of the other
children's safety
Let the parents feel for their children's
sacrifice,
Otherwise, the safety valve would never
hish.

Now, the 'martyr children' of the day will
save
thousands of children of their country
Who will fetch guarantee for their
protection by
the elders of the society.
'Agni' will fly again to glorify the
humanity.

NOW AVAILABLE

PENSION APPLICATION FORMS

Price : Rs. 10.00 each

Contact :

A. B. T. A. Office

Satyapriya Bhawan
P-14, Ganesh Chandra Avenue
Kolkata-700 013

PROFORMA FOR RESTORATION OF COMMUTED PORTION OF PENSION OF THE TEACHERS AND EMPLOYEES OF NON-GOVT. EDUCATIONAL INSTITUTIONS

To

The Treasury Officer...../Pension Disbursing Officer, Purta Bhavan, Salt Lake, Kolkata-700 091.

Subject : Restoration of Commuted Portion of Pension after 15 years.

Sir,

Kindly restore the Commuted Portion of Pension of the Pensioner whose particulars are given below in terms of Government of West Bengal, School Education Department.

Memo No. 35-SE(B) Date : 6.2.2004.

PARTICULARS

1. Name in Block Letters :
2. Date of Retirement :
3. P.P.O. No. :
4. Amount of Original Pension :
5. Amount of Pension Commuted :
6. Name of the Treasury :
7. Name of Bank & Bank A/C No. through which pension is now being drawn :

Date

Present Address Signature of Pensioner/Legal Heir (s)

NOTE : Where the Legal Heirs are more than one in number, they may indicate their full names and addresses with signatures in the Blank place provided being or on the reverse.

ALL BENGAL TEACHERS' ASSOCIATION

Satyapriya Bhaban
P-14, Ganesh Chandra Avenue, Kolkata - 700 013

To
The Heads of all Higher Secondary Institutions in West Bengal

Dear Friends,

The All Bengal Teachers' Association will organise the Inter-School Evaluation Programme for the Students of Class-XII, who will appear for Higher Secondary Examination (+2) for the year 2005 also.

The Association hopes that an assessment of the students on the basis of its papers will help correct evaluation of their achievements.

We would, therefore, appeal to the Heads of all Higher Secondary Institutions to join the Inter-School Evaluation Programme of Students for Class-XII organised by the Association. Necessary information in this respect is given below.

(1) All the Schools and Colleges joining the Evaluation will have to follow a common programme as given in next page.

(2) Orders in enclosed printed form are kindly to be communicated to the office of the Association so as to reach it on or before the 30th September, 2004 under signature of the Head of the Institution with seal of the Institution concerned and postal address clearly be indicated.

(3) The number of Students in each Language and Elective Subjects are to be clearly indicated in the orders so placed.

Yours fraternally,
Mitra Bhattacharya
General Secretary (Acting)

Dated : 2nd July, 2004

SUBSCRIPTION PAYABLE
(Excluding Postage Charges)

Papers of all subjects for Every Students	**Rs. 8/- (Eight) Only**

N.B. - To avoid postal disturbances, schools situated in the district of Kolkata, South & North 24 Parganas, Howrah, Hooghly, Purba & Paschim Medinipur and Nadia are requested to collect their question packets from the Central Office and schools situated in North Bengal, Murshidabad, Purulia, Bankura, Birbhum and Burdwan are requested to collect their packets from the District Branch Office of A. B. T. A.

(Programme overleaf)

A. B. T. A. Higher Secondary Evaluation Programme, 2004

(12 CLASS)

PROGRAMME

Date	Morning From 10 A.M. to 1 P.M.		Afternoon From 1.30 P.M. to 4.30 P.M.	
25.11.04	Bengali (Group -A)	I	Bengali (Group -A)	II
	Hindi (Group -A)	I	Hindi (Group -A)	II
	Urdu (Group -A)	I	Urdu (Group -A)	II
	Nepali (Group -A)	I	Nepali (Group -A)	II
	English (Group -A)	I	English (Group -A)	II
27.11.04	English (Group -B)	I	English (Group -B)	II
29.11.04	Biological Sciences	I	Biological Sciences	II
	Physiology	I	Physiology	II
	Home Management & Home Nursing	I	Home Management & Home Nursing	II
	Business Economics including Business Mathematics	I	Business Economics including Business Mathematics	II
30.11.04	Computer Science	I	Computer Science	II
	Computer Application	I	Computer Application	II
	Music (1st Half only)	I		
02.12.04	Mathematics	I	Mathematics	II
03.12.04	Political Science	I	Political Science	II
	Sociology	I	Sociology	II
06.12.04	Psychology	I	Psychology	II
	Philosophy	I	Philosophy	II
	Geography	I	Geography	II
	Economic Geography	I	Economic Geography	II
07.12.04	Statistics	I	Statistics	II
	Sanskrit	I	Sanskrit	II
	Arabic	I	Arabic	II
	Agronomy	I	Agronomy	II
	Persian	I	Persian	II
	French	I	French	II
08.12.04	Anthropology	I	Anthropology	II
	Economics	I	Economics	II
09.12.04	Chemistry	I	Chemistry	II
	History	I	History	II
	Accountancy	I	Accountancy	II
11.12.04	Physics	I	Physics	II
	Nutrition	I	Nutrition	II
	Education	I	Education	II
	Business Organisation	I	Business Organisation	II

Phone : 2215-8856/9158
Fax : 2215-7932

A. B. T. A. Inter-School Evaluation Programme, 2004

for student of CLASS - X

Programme

10.00 A.M. to 1.00 P.M.		10.00 A.M. to 1.00 P.M.	
25.11.2004	First Language (First Paper) Bengali / Hindi / Urdu / Nepali (Written Test 90 Marks)	01.12.2004	Geography (Written Test 90 Marks)
27.11.2004	First Language (Second Paper) Bengali / Hindi / Urdu / Nepali (Written Test 90 Marks)	02.12.2004	Life Science (Written Test 90 Marks)
29.11.2004	English (Second Language) (Written Test 100 Marks)	03.12.2004	History (Written Test 90 Marks)
30.11.2004	Physical Science (Written Test 90 Marks)	04.12.2004	Additional Subjects (Written Test 100 Marks)
		06.12.2004	Mathematics (Compulsory) (Written Test 100 Marks)

Any one of the following Additional Subjects

Academic :- Additional Mathematics / Physics / Chemistry / Biology / Mechanics / Geography / Logic / Psychology / Pisciculture / Business Method and Correspondence / Book Keeping / Elements of Economics and Civics / Home Science including Home Nursing (for Girls) / Sanskrit / Persian / Arabic / Urdu / Music, Hindi (B-Level) / Bengali (B-Level) / Computer Application

Oral Examination on 10.12.2004

First Language	20 Marks
Physical & Life Science	10+10 = 20 Marks
History	10 Marks

SUBSCRIPTION PAYABLE

(Excluding Postage Charges)

Papers of all Subjects for Every Student Rs. 8.00 (Eight) only

Sd/- Mitra Bhattacharya
General Secretary (Acting)
All Bengal Teachers' Association
Satyapriya Bhaban
P-14, Ganesh Chandra Avenue, Kolkata-13

Date : 2nd July, 2004

To
The Headmaster/Headmistress,

.....

Dear Sir/Madam,

This is to acknowledge receipt of your Letter No. ..... dated ..... for supply of Evaluation Paper. The order will receive due attention. You are requested to follow the above programme.

Yours faithfully,
Mitra Bhattacharya
General Secretary (Acting), A. B. T. A.

Phone : 2215-8856/9158
Fax : 2215-7932

A. B. T. A. Inter-School Evaluation Programme, 2004

(CLASS - X)

Programme

MORNING SET

6.45 A.M. to 9.45 A.M.

25.11.2004	First Language (First Paper) (Written Test 90 Marks)
27.11.2004	First Language (Second Paper) (Written Test 90 Marks)
29.11.2004	English (Second Language) (Written Test 100 Marks)
30.11.2004	Physical Science (Written Test 90 Marks)

6.45 A.M. to 9.45 A.M.

01.12.2004	Geography (Written Test 90 Marks)
02.12.2004	Life Science (Written Test 90 Marks)
03.12.2004	History (Written Test 90 Marks)
04.12.2004	Additional Subjects (Written Test 100 Marks)
06.12.2004	Mathematics (Compulsory) (Written Test 100 Marks)

Oral Examination on 10.12. 2004

First Language	20 Marks
Physical & Life Science	10+10 = 20 Marks
History	10 Marks

SUBSCRIPTION PAYABLE

(Excluding Postage Charges)

Papers of all Subjects for Every Student Rs. 8.00 (Eight) only

Sd/- Mitra Bhattacharya
General Secretary (Acting)
All Bengal Teachers' Association
Satyapriya Bhaban
P-14, Ganesh Chandra Avenue, Kolkata-13

Date : 2nd July, 2004

To
The Headmaster/Headmistress,

.....

.....

Dear Sir/Madam,

This is to acknowledge receipt of your Letter No. ....., dated ..... for supply of Evaluation Paper. The order will receive due attention. You are requested to follow the above programme.

Yours faithfully,
Mitra Bhattacharya
General Secretary (Acting), A. B. T. A.

Phone : 2215-8856/9158
Fax : 2215-7932

A. B. T. A. Inter-High Madrasah Evaluation Programme, 2004

for students of Class - X

Programme

11.00 A.M. to 2.00 P.M.		11.00 A.M. to 2.00 P.M.	
25.11.2004	First Language (First Paper) - Bengali (Written Test 90 Marks)	04.12.2004	Mathematics (Written Test 100 Marks)
27.11.2004	First Language (Second Paper) - Bengali (Written Test 90 Marks)	06.12.2004	Physical Science (Written Test 90 Marks)
29.11.2004	Second Language - English (Written Test 100 Marks)	07.12.2004	Geography (Written Test 50 Marks)
30.11.2004	History (Written Test 90 Marks)	08.12.2004	Third Language - Arabic (Written Test 100 Marks)
01.12.2004	Life Science (Written Test 90 Marks)	09.12.2004	Additional Subjects (Written Test 100 Marks)
02.12.2004	Advance Paper in Arabic (Written Test 100 Marks)		

Oral Examnation – 11.12.04

First Language	20 Marks
Physical Science	10 Marks
Life Science	10 Marks
History	10 Marks

SUBSCRIPTION PAYABLE
(Excluding Postage Charges)

Papers of all Subjects for Every Student Rs. 8.00 (Eight) only

Last Date of submission of Forms :-

Madrasah to Distribution Centres : 15.01.2005
Distribution Centres to Board : 18.01.2005

Sd/- Mitra Bhattacharya
General Secretary (Acting)
All Bengal Teachers' Association
Satyapriya Bhaban
P-14 Ganesh Chandra Avenue, Kolkata-13

Date : 2nd July, 2004

To
The Headmaster/Headmistress,

.....

Dear Sir/Madam,

This is to acknowledge receipt of your Letter No. ..... dated ..... for supply of Evaluation Paper. The order will receive due attention. You are requested to follow the above programme.

Yours faithfully,
Mitra Bhattacharya
General Secretary (Acting), A. B. T. A

Board Circular

No. EMU/C/35

Date : July 14, 2004

WEST BENGAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

77/2, PARK STREET, KOLKATA-16

MADHYAMIK PARIKSHA (SECONDARY EXAMINATION), 2005
(BOTH REGULAR AND EXTERNAL CANDIDATES)

N O T I F I C A T I O N

It is notified for all concerned that the Madhyamik Pariksha (Secondary Examination), 2005 (both Regular and External) will be held as per following Programme.

The Examination will be held from 12 noon to 3 p.m. Only one paper on each day. The dates and corresponding subjects are as under :

PROGRAMME

Day	Date		Subject/Paper (12 Noon to 3 P.M.)
Friday	25th February, 2005	–	First Languages Paper-I
Saturday	26th February, 2005	–	First Languages Paper-II
Monday	28th February, 2005	–	Second Languages
Tuesday	1st March, 2005	–	History
Wednesday	2nd March, 2005	–	Geography
Thursday	3rd March, 2005	–	Physical Science
Friday	4th March, 2005	–	Life Science
Saturday	5th March, 2005	–	All Additional Subjects. (Except WPS)
Monday	7th March, 2005	–	Mathematics

N.B. : The dates for Physical Education & Social Service and Work Education Examinations are as under :

Physical Education – 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 28th, 29th, 30th, 31st March, 2005, 1st April, 2005 in respective schools.

And

Work Education – 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 11th, 12th, 13th, 14th, 16th, 18th, 19th, 20th & 21st April, 2005 in respective schools.

★ First Languages – Bengali, English, Gujarati, Hindi, Modern Tibetan, Nepali, Oriya, Punjabi (Gurmukhi), Tamil, Telugu, Urdu & Santali.

★ Second Languages – (i) English, if any languages other than English is offered as First Language.
(ii) Bengali or Nepali, if English is the First Language.

(a) Examination in Short-hand & Typewriting will be held at Kolkata and Siliguri only. The Venue and Date will be announced later on.
(b) Examination in Sewing and Needle Work will be of four hours' duration.
(c) Examination in Music (Vocal) and Music (Instrumental) will be of 2 hours' duration for theoretical portion. The venue, date and hour for the Practical Examination in these subjects (which will be held at Kolkata, Burdwan & Siliguri only) will be announced later on.
(d) Examination in Computer Application will be of two and half hours' duration for theoretical portion and two hours for practical portion. The venue and date for the Practical Examination in this subject will be announced later on.

Sd/- Gopa Basu (Dutta)
Deputy Secretary (Examination)

NOW AVAILABLE

Revision of Pensionary Benefits of the West Bengal Recognised Non-Government Educational Institution Employees, 1999

PRICE : Rs. 10.00

CONTACT :

A. B. T. A. Office
Satyapriya Bhawan
P-14, Ganesh Chandra Avenue
Kolkata-700 013

Strengthen Your Organisation !

Enlist Yourselves As Members of A.B.T.A.

Send Your Subscription

Teachers' Journal

Rs. 60/- for High, Higher Secondary Schools, High Madrasahs & Senior Madrasahs and for Junior High Schools & Junior Madrasahs

Membership Fee :
Rs. 25.00 for Teacher and Non-Teaching Staff (Per Head Per Year)

Individual Member :
Membership Fee Rs. 25.00 Per Year
Teachers' Journal Rs.60.00 Per Year

Others :
Only Teachers' Journal Subscriber Rs. 60.00 Per Year
Single Copy Rs. 5.00

NOW AVAILABLE

SELECTED WRITINGS AND SPEECHES OF SATYAPRIYA ROY

Price : Rs. 100.00

Contact :

A. B. T. A. Office

Satyapriya Bhawan
P-14, Ganesh Chandra Avenue
Kolkata-700 013

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি

রাজ্য শাখা পরিচালিত

হলিডে হোম

বক্রেশ্বর

সত্যপ্রিয় রায় স্মৃতি বিশ্রাম ভবন-এর ভাড়া

শয্যা	ভাড়া প্রতিদিন		জামানত	ঘরের সংখ্যা
	সদস্য	সদস্য নয়		
৪	৭৫·০০	১০০·০০	১০০·০০	৮

দীঘা

রথীন্দ্রকৃষ্ণ বিরাম নিলয়-এর ভাড়া

কুটির

শয্যা	ভাড়া প্রতিদিন		জামানত	ঘরের সংখ্যা
	সদস্য	সদস্য নয়		
৬	১০০·০০	২০০·০০	২০০·০০	৮

ডরমেটারী ঘর

শয্যা	ভাড়া প্রতিদিন	জামানত	ঘরের সংখ্যা
২	৫০·০০	৫০·০০	১
৩	৭০·০০	৭০·০০	১
৪	৯০·০০	৯০·০০	২
৬	১৩০·০০	১৩০·০০	২

ডরমেটারী হল

শয্যা	ভাড়া প্রতিদিন	জামানত	ঘরের সংখ্যা
২০	শয্যাপ্রতি ২০·০০	শয্যাপ্রতি ২০·০০	১
২৮	শয্যাপ্রতি ২০·০০	শয্যাপ্রতি ২০·০০	১

হলিডে হোম বুকিং করতে অবশ্যই সমিতির স্কুল/মহকুমা বা জিলা শাখার কর্তৃপক্ষের পরিচয়পত্র সঙ্গে আনতে হবে। এছাড়া সমিতির সদস্য ব্যতীত ব্যক্তি নিজ নিজ অফিস কর্তৃপক্ষের পরিচয়পত্র সঙ্গে আনতে হবে।

জামানত ঃ ভ্রমণশেষে ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকলে তা বাদ দিয়ে এবং দীঘা হলিডে হোমের কুটির ভাড়ার ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ খরচের টাকা বাদ দিয়ে কেন্দ্রীয় অফিস থেকে ফেরৎ পাওয়া যাবে।

ডরমেটারী হল/ঘর ব্যবহারকারীগণ, প্রয়োজনে রান্নার জায়গা ব্যবহার করলে প্রতিদিন ৬০ টাকা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অতিরিক্ত দিতে হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
পি-১৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ
কলকাতা-৭০০ ০১৩
দূরভাষ ঃ ২২১৫-৮৮৫৬, ২২১৫-৯১৫৮

Library

Regd. No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP-225/2004-06 মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ-প্রবর্তিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক

K. C. Nag ● Prof. K. Basu
H.S. MATHEMATICS
[Eng. & Beng. (Vol-I & II)]

P. K. De Sarkar
HIGHER SECONDARY ENGLISH GRAMMAR & COMPOSITION

Chowdhury ● Chattopadhyay ● Bardhan
A TEXT BOOK OF BIOLOGY
[Vol-I & II]

বর্দ্ধন ● সেন ● ভক্ত
উচ্চমাধ্যমিক জীববিজ্ঞান
(প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র — দুই খণ্ডে)

ডঃ মহাদেব দাসখান
উচ্চমাধ্যমিক পদার্থবিদ্যা
(প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র — দুই খণ্ডে)

JOINT ENTRANCE PHYSICS [MODULE BASED]

SHORT ANSWER TYPE QUESTIONS & PROBLEMS ON PHYSICS
(বাংলা সংস্করণ — দুই খণ্ডে)

অধ্যাপক শ্যামলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
দর্শন প্রবেশিকা

শচীন্দ্রনাথ মণ্ডল
আধুনিক ভারতের ইতিহাস (প্রথম পত্র)
আধুনিক ইউরোপ ও বিশ্বের ইতিহাস
(দ্বিতীয় পত্র)

অধ্যাপক উৎপল রায়
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE

ডঃ নারায়ণী বসু
গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রূষা
খাদ্য ও পুষ্টি (Nutrition)

বর্দ্ধন ● সেন
জয়েন্ট এন্ট্রান্স জীববিজ্ঞান
(মডিউল ভিত্তিক)

জয়েন্ট এন্ট্রান্স উচ্চমাধ্যমিক
প্রশ্নোত্তরে জীববিজ্ঞান
(বাংলা সংস্করণ — দুই খণ্ডে)

Chowdhury I Bardhan
PROBLEMS ON BIOLOGICAL SCIENCES
[In English]

ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
ফোন ঃ ২২৪১-০৯৬৫/৯৪০৪

Printed by Adhikram Sanyal at the Ganashakti Printers (P) Ltd. 33.Alimuddin Street, Kolkata-700 016
and also published by him at the A.B.T.A. Office, 15,Bankim Chatterjee Street, Kolkata-700 073